HISTORY OF COOCH BEHAR.

BY

BHAGAVATI CHARAN BANERJEE,

Sub-Deputy Superintendent of Schools in Cooch Behar.

কোচবিহারের ইতিহাস

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

Cooch Behar:

PRINTED AT THE COOCH BEHAR STATE PRESS.

1884.

HISTORY OF COOCH BEHAR.

BY

BHAGAVATI CHARAN BANERJEE

Sub-Deputy Superintendent of Schools in Cooch Behar.

কোচবিহারের ইতিহাস

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

Cooch Behar:

PRINTED AT THE COOCH BEHAR STATE PRESS.

1884.

TO HIS HIGHNESS THE MAHARAJAH

NRIPENDRA NARAYAN BHUP BAHADOOR OF COOCH BEHAR,

THE WORK

IS MOST RESPECTFULLY DEDICATED

BY

HIS OBLIGED AND GRATEFUL SERVANT,

THE AUTHOR.

বিদ্যোৎসাহী কোচবিহারাধিপ

শ্রীলশ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভুপ বাহাদুর

মহোদয় সমীপেষু।

মহারাজ! অদ্যাপি কোচবিহারের কোনও এক খানি ইতি বৃত্ত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত না হওয়াতে, এতদ্দেশীয়দিগের একটী বিশেষ অভাব আছে বলিতে হইবে। আমি এই অভাব দূরীকরণ মানসে, প্রচুর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছি। যদিও অকিঞ্চিৎকরত্ব নিবন্ধন, ইহা ভবদীয় গৌরবান্বিত নামের সংশ্রব লাভে নিতান্তই অযোগ্য, তথাপি কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সামান্য উপহারও সজ্জনগণ আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং স্পর্শ মণি সংযোগে নিতান্ত অনুপাদেয় বস্তুও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বসাধারণের নিকট আদৃত হইয়া থাকে; এই বিশ্বাস ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই, আপনার চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গ করিলাম।

বিনয়াবনত

শ্রীভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

LIST OF BOOKS AND AUTHORS CONSULTED.

1. Colonel Dalton's Descriptive Ethnology of Bengal.
2. Doctor Latham's ethnology of India.
3. Mr. Brian Hodgson's Essay on Koch, Bodo and Dhimal tribes.
4. Dr. Francis Buchanan's History of Kamroop and Rungpur &c. &c.
5. W. W. Hunter's statistical returns of Cooch Behar, Rungpur and Jalpaigury, &c. &c.
6. Captain T. H. Lewin's account of Cooch Behar.
7. Turner's Bhootan.
8. Robinson's Assam.
9. Mr. E. Glazier's report on Rungpur.
10. Journals of the Royal Asiatic Society and Asiatic Society of Bengal.
11. Asiatic Researches.
12. Annual administration reports of Cooch Behar from 1864-65 to 1882-83.
13. Major Jenkins' report on Cooch Behar.
14. Messrs Lawrence Mercer and John Lewis Chauvet's report on Cooch Behar.
15. Selected records of Bengal Government.
16. Aitchison's treaties of India.
17. Mr. Scott's sketch of Bhutan.
18. Thomas. A. Becket's report on the settlement of Cooch Behar.
19. Rajopakhyan or History of Cooch Behar translated in English by Mr. Robinson.
20. A Bengali History of Darjiling.
21. A Bengali History of Bijni.
22. A Geography of Bengal by Baboo Dina Nath Sen.
23. Sir Richard Temple's remarks on the administration of Cooch Behar, dated 6th July 1875.
24. The Cooch Behar Gazette.

&c. &c. &c.

বিজ্ঞাপন।

প্রায় তিন বৎসর গত হইল আমি "কোচবিহারের বিবরণ" নামক এক খানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা এতদ্দেশীয় পাঠশালা সমূহের ছাত্র বৃন্দের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে প্রণয়ন করি। তদ্দর্শনে এ রাজ্যের দেওয়ান, শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর মহোদয়, আমাকে কোচবিহারের এক খানা সুশৃঙ্খল ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেন এবং আমিও তদনুসারে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। কিন্তু কিছু কাল পরে এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়ি যে, প্রায় এক বৎসর কাল আর ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। পরে পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়া এখন তাহা মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইলাম।

ভারতবর্ষের মধ্যে এরূপ রাজ্য অতি বিরল, বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীতে যাহার যথাযথ ইতিহাস লিখিত হয় নাই। এমন কি বঙ্গ দেশের অধিকাংশ জমিদার পরিবারের নিজ নিজ বংশাবলী সম্বলিত ইতিহাসও দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, কোচবিহার একটী বহু কালের স্বাধীন রাজ্য কিন্তু বাঙ্গলা কি ইংরেজী ভাষায় তাহার সম্যক্ বিবরণ এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। রাজোপাখ্যান নামে এক খানা ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই এবং তাহাও অকিঞ্চিৎকর কাল্পনিক উপন্যাসেই পরিপূর্ণ, তৎপাঠে দেশের প্রকৃত অবস্থা কিছুই অবগত হওয়া যায়না। আমি এই অভাব নিরাকরণ মানসে এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এ রাজ্যে আমি যে কার্য্যে আছি, সেই কার্য্যের স্বভাবেই আমাকে দিবারাত্রি স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে হইতেছে। কোচবিহারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান ও তাহার অধিবাসীদিগকে দেখিয়াছি। অসূর্য্য-স্পর্শ্য পথে গতিবিধি করিয়া, জঙ্গলময় অনেক স্থানও দেখিয়াছি। পৌরাণিক কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অনেক দেখিয়াছি। যে স্থানে যে

বিবরণ পাইয়াছি, সংগ্রহ করিতে ত্রুটী করি নাই। স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া ৪।৫ বৎসরের পরিশ্রমে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। যে কোনও পুস্তকে কোচবিহার সম্বন্ধীয় কোনও ঘটনা উল্লিখিত আছে, তাহাও অধ্যয়ন করিতে ত্রুটী করি নাই। যাহা জানিয়াছি পাঠকগণের নিকট তাহা উপস্থাপিত করিলাম। তাঁহারা হয়ত পড়িবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় চাহিবেন, তাহা আমার এই পুস্তকে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যাহা আছে তাহা এক বার অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই, আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এ রাজ্যের দেওয়ান, শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর মহোদয়, বিশেষ যত্ন না করিলে, আমি এই কার্য্যে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। আমি যখন যে প্রকারের সাহায্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাই তিনি অম্লান বদনে প্রদান করিয়াছেন। সেই সদাশয়ের আন্তরিক যত্ন, উদ্যোগ এবং উৎসাহই আমাকে সম্যক প্রোৎসাহিত করিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি এবং এ রাজ্যের ফৌজদারী আহেলকার শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, অপরিসীম পরিশ্রম সহকারে পুস্তকখানা আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন। ইহাঁদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

এতদ্ব্যতীত আমার কতিপয় বন্ধু কর্ত্তৃক আমি যে উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য আর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যক করেনা।

কোচবিহার
১৫ই মাঘ, ১২৮৯ সন

শ্রীভগবতীচরণ শর্ম্মা

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

কোচবিহারের ইতিহাস দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এবারে অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে, মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ অনেকগুলি বর্ণগত অশুদ্ধি ছিল, তাহা এবারে সংশোধন করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হইলে, এ দেশীয় অনেক লোক, কোন কোন অংশ প্রচারিত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। বিশেষতঃ যে অংশে, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি এবং অধিবাসীদিগের বিবরণ বিবৃত হইয়াছিল, তাহাতেই অনেককে আপত্তি উত্থাপন করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলিতে পারি যে, কোন ব্যক্তি, কি সম্প্রদায় বিশেষকে অপমানিত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের অসন্তুষ্টি উৎপাদন করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই ইংরেজীর অনুবাদ। শ্রীযুক্ত কুমার গোবিন্দনারায়ণ সাহেবের অভিপ্রায় মত, আমরা এবারে সেই সকল অংশ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। সর্ব্ব সাধারণের সুবিধা জন্য এবারে পুস্তকের মূল্য বার আনা নির্দ্দিষ্ট করা গেল।

৩১ আষাঢ়
১২৯১ সন

শ্রীভগবতীচরণ শর্ম্মা।

উপক্রমণিকা।

অনাবশ্যক বোধেই হউক অথবা অনভিজ্ঞতা জন্যই হউক, হিন্দু কি মুসলমান রাজত্বকালে বোধ হয় ভারতবর্ষ কি তদন্তর্গত কোনও প্রদেশের যথাযথ ভৌগোলিক কি ঐতিহাসিক সমীচীন বিবরণ কিছু লিখিত হইয়াছিল না, অথবা লিখিত হইয়া থাকিলে, কালে তাহার বিলোপ হইয়াছে, কিন্তু অধুনা তত্তাবদবধারণ এক রূপ সুদূরপরাহত। যে সময়ে প্রাচীন হিন্দুগণ, আধুনিক হিন্দুদিগের ন্যায় পরকীয় কঠিন শাসনে নিতান্ত হীনতেজ, হীনপ্রাণ ও হীন সাহস হইয়া না পড়িয়াছিলেন, যখন তাঁহারা অধীনতার দৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধপদ হইয়া, একমাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থলে, নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতে বাধ্য ছিলেন না; যাঁহারা ভুজবীর্য্যে বলদর্পিত প্রবল শত্রুকেও অকাতরে সুদূরে বিতাড়িত করিতে পারিতেন, স্বাধীনতার প্রবলোৎসাহে যাঁহাদের স্বাধীন আর্য্যমনের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত ছিল, বস্তুতঃ ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল, বিদেশীয় নির্দ্দয় হস্তে দৃঢ় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল না, তখন হিন্দুস্থানে বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইয়া হিন্দুগণের যশঃ সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়াছিল। এমন বিষয় নাই যাহাতে হিন্দুগণ হস্তক্ষেপ না করিয়াছিলেন। অথচ যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই এত দূর পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, কোনও কালে কোনও দেশে এতাদৃশী অবাঙমনসকীর্ত্তিতা সমুন্নতি প্রদর্শিত হয় নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্র সংক্রান্ত অভাবনীয় বিষয় নিচয়ের গূঢ়তম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, তৎসমস্তের যে অতি পরিষ্কার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই জ্ঞানালোক সম্প্রোজ্জ্বল ঊনবিংশ শতাব্দীরও মহদালোচনীয় স্থল হইয়া রহিয়াছে। উহা যে কত পুরুষানুক্রমিক তথ্যানুসন্ধিৎসা ও অভিজ্ঞতার ফল, তাহা অধুনাতন লোকের মনে ধারণা করাও দুষ্কর। এরূপ তীক্ষ্ণমনীষাসম্পন্ন হিন্দুগণ যে ভূগোল ও

ইতিহাসে একবারেই মনোযোগ বিধান করিয়াছিলেম না, মন এরূপ বিশ্বাস করিতে চাহেনা। বোধ হয় তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব ও উন্নতি সময়ে, উভয় বিষয়েরই বিলক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল, তাঁহারা ঐ উভয়বিধ বিদ্যাতেই সম্যক কৃতবিদ্য ছিলেন এবং ধ্রুব বিশ্বাস হয়, তত্তদ্বিষয়ক পুস্তকেরও অভাব ছিলনা। কিন্তু হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমান রাজগণের, অসারতা, মূর্খতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও হিন্দুশ্রীকাতরতায় তৎসমস্ত অগ্নিসাৎ বা জলসাৎ হইয়াছে। স্বাধীনতার বিলোপে হিন্দুমনের নিস্তেজস্কতা প্রতিপাদিত হইলে, আর কেহও কোন বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে সাহস পাইতেন না এবং অনেক স্থলে বিশেষ প্রয়াসেও উহা সুসম্পাদিত হইয়া উঠিত না, কেহ কোন গ্রন্থ লিখিতেন না, কাজেই বিলুপ্ত পুস্তকাবলীর শূন্য স্থান আর পরিপূরিত হইল না। গ্রন্থ না লিখিবার অন্যবিধ কারণও ছিল। পুস্তক প্রস্তুত হইলেই তাহা মুসলমানগণের অত্যাচারে বিনষ্ট হইবে নিশ্চয় জানিয়া, কেহই পুস্তক লিখার অনর্থ পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত হইতেন না। বিশেষতঃ ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি, মানসিক উৎকর্ষতার বিশেষ পরিচায়ক নহে বলিয়া, তাঁহারা উহাতে কতক কতক ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক যে কারণেই [illegible] হিন্দুগণের প্রণীত এরূপ কোন গ্রন্থ দেখা যায় না।

বিলাসী মুসলমান রাজগণের রাজত্বকালে বিদ্যার তাদৃশী আলোচনা ছিলনা, কাজেই কোনও বিষয়েই গ্রন্থের বহুল প্রচার দেখা যায় না। আরব ও পারস্য দেশে যে সকল পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তৎপাঠেই তাঁহারা এক রূপ তৃপ্ত থাকিতেন। এবং সে সমস্ত পুস্তক পাঠই বিদ্যালোচনার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন। প্রকৃত বিদ্যানুরাগী সদাশয় আকবর সম্রাটের সময়ে, এক-খানা ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তৎসাময়িক যুদ্ধ বৃত্তান্তই বাহুল্যরূপে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং যেখানে কোনও প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটনা হয় নাই, তাহার উল্লেখ মাত্রও নাই। তৎপাঠে বাস্তবিক কোনও প্রদেশ বিশেষের বিশেষ বিবরণ কিছু অবগত হওয়া যায় না। কিম্বদন্তী পরম্পরায় ও লৌকিক গাথায় অনেক দেশের

অনেক বিবরণ পরপুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। সত্য হউক মিথ্যা হউক তদনুসরণ করিয়াই, কতক পৌরাণিক বিবরণ জানা গিয়া থাকে। সম্প্রতি ইংরেজ মহাত্মাগণের অযাচিত প্রসাদে অনেক দেশেরই অধুনাতন অনেক বিবরণ অবগত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহারাও আমাদের মত অনভিজ্ঞ। সকলকেই জনশ্রুতিমূলে, সম্ভাবনায়, মতস্থির করিতে হইয়াছে। সুতরাং পৌরাণিক ইতিহাস সম্বন্ধে, দৃঢ়তার সহিত কিছুই বলা যাইতে পারেনা। তদ্বিষয়ে দৃঢ় উক্তি কেবল ধৃষ্টতা প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে দেশেরই বিবরণ লিখিতে যাওয়া যাউক না কেন, প্রবাদ আছে পূর্ব্বকালে এস্থানে এমন ছিল, ঐ স্থানে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল ইত্যাদি লিখিতে হইবে। নিশ্চয়তার সহিত কিছুই লেখা যাইতে পারে না। উপরোক্ত কারণ বশতঃই দ্বিতীয় খণ্ডে "কাল্পনিক সময়" এই শিরোনাম প্রদত্ত হইয়াছে।



PART I.

GENERAL DESCRIPTION.

প্রথম খণ্ড।

সাধারণ বিবরণ

কোচবিহারের ইতিহাস।

অবস্থান।

কোচবিহার ২৫° ৫৭′ ৪০″ এবং ২৬° ৩২′ ৩০″ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৮° ৪৭′ ৪০″ হইতে ৮৯° ৫৪′ ৩৫″। ১৮৮১ সনের গণনায় লোক সংখ্যা ৬০০৯৪৬ স্থির হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩১০৭৮৯ পুরুষ এবং ২৯০১৫৭ স্ত্রীলোক। রঙ্গপুর এবং জলপাইগুড়ীর অন্তর্গত ছিট সমূহ সহিত পরিমাণ করিলে এরাজ্যের পরিমাণ ফল ১৩০৭ বর্গ মাইল।

থানার নাম	পরিমাণ	ছিটের পরিমাণ	মোট
হলদিবাড়ী	৬৫ বর্গমাইল	২৪.১১ বর্গমাইল	৮৯.১১ বর্গমাইল
মেকলীগঞ্জ	১০৩ ,,	১.৫ ,,	১০৪.৫ ,,
মাথাভাঙ্গা	৩৪২ ,,	৩.১ ,,	৩৪৫.১ ,,
দীনহাটা	২৬৭ ,,	৩.৩ ,,	২৭০.৩ ,,
সদর	৩০৯ ,,	০ ,,	৩০৯ ,,
তুফানগঞ্জ	১৮৯ ,,	০ ,,	১৮৯ ,,
			১৩০৭.০১ ,,

কোচবিহারের উত্তর সীমা ভোটান্ত প্রদেশ,* পূর্ব্বসীমা ভোটান্ত প্রদেশ, গোয়ালপাড়া ও রঙ্গপুর। শোণকোষ এবং

* এই প্রদেশ পূর্ব্বে ভোটানরাজের অধিকৃত ছিল। ১৮৬৪। ৬৫ সনের যুদ্ধে ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা জলপাইগুড়ী জেলার অন্তর্গত।

গদাধর নদী অনেক স্থান পর্য্যন্ত এ রাজ্যের সীমাস্থলে অবস্থিত দক্ষিণ সীমা রঙ্গপুর, পশ্চিম সীমা জলপাইগুড়ী ও রঙ্গপুর।

ভূমির প্রকৃতি।

কোচবিহারে কোন পর্ব্বত নাই, ইহা সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। নদ নদী প্রসবিনী হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী বিধায় এ প্রদেশ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদ নদী দ্বারা পরিপূর্ণ। এখানকার মৃত্তিকা বালুকাময় অথচ অত্যন্ত উর্ব্বরা। কঠিন মৃত্তিকা একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিলেই হয়। নদীগর্ভ নিরবচ্ছিন্ন বালুকা ও প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ। বালুকা মিশ্রিত হওয়ায় মৃত্তিকার কাঠিন্য একবারে নাই, কাজেই কর্ষণ কার্য্য অতি সহজে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকা শিথিল হওয়াতে নদী প্রবাহ নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এজন্য এ প্রদেশে মরা নদীর সংখ্যা অধিক। অনবরত প্রবাহ পরিবর্ত্তন করাতে নদীর উভয় পার্শ্বস্থ স্থান সমূহ বালুকা পূর্ণ ও অনুর্ব্বর, তথায় শস্যাদি জন্মেনা, নিয়তই অন্যান্য জঙ্গলে আবৃত থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে প্রায় সমুদয় নদীর উভয় তীরেই কেশে ও নল খাগড়ায় পরিপূর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে কেশেবন ধবল বর্ণ ফুল সমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যায়; এই সকল স্থান ১০।১৫ বৎসরের মধ্যেই জঙ্গলের গলিত পত্র ফুল ও ফলের প্রভাবে উর্ব্বরা হইয়া শস্যোৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়। কোচবিহারের উত্তর পশ্চিম ভাগ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বভাগ ক্রমশঃ গড়ে প্রতি মাইলে ১ ফুট নিম্ন সুতরাং নদ নদী সমস্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব বাহিনী।

এদেশের প্রাকৃতিক গঠন সম্বন্ধে কাপ্তান লুইন সাহেব নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতি পুরাকালে ভারত

মহাসাগর হিমালয়ের পদতল পর্য্যন্ত বিস্তৃতছিল, মধ্য আসিয়ার মালভূমি হইতে অনেক নদ নদী হিমালয় পর্ব্বতস্থ গুহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পর্ব্বতস্থ অনেক পদার্থ নিম্নে আনয়ন করতঃ সমুদ্রগর্ভে বঙ্গদেশের ব দ্বীপ সৃজন করে। এইরূপে সমুদ্র গর্ভ যখন ব দ্বীপে পরিণত হয়, তখন স্থানেং বালুচরের সন্নিবেশ বশতঃ একমাত্র নদী স্রোতই বহুস্রোতে বিভক্ত হয়। এই সকল ব দ্বীপ বর্ষাকালে ডুবিয়া যাইত; তন্নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নূতন মৃত্তিকা সংস্থাপিত হওয়াতে ঐ সকল স্থান অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছিল। নদী সকল পার্ব্বতীয় প্রদেশের নিকট অত্যন্ত বেগবতী থাকে; এই নিমিত্ত কোচবিহারের নদী সকলের গতি কোনক্রমেই রোধকরা যায়না এবং প্রত্যেক বৎসর নূতন নূতন স্থান দিয়া প্রবাহিত হয় কখন বা ঘটনাক্রমে পূর্ব্বস্থানে থাকে। তীরবর্ত্তী বালুকা ও মৃত্তিকাতে নদীর গতি কোন প্রকারে প্রতিরোধ করিতে পারে না; এই নিমিত্ত কখন্ কোন্ স্থান নদী গর্ভস্থ হয় তাহার কোন স্থিরতা থাকে না; বৃক্ষাদিও এই কারণে অধিক বড় হইতে পারেনা, যেহেতু অধিক কাল বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই নদীগর্ভস্থ হইয়া যায়। আমাদের বিবেচনায় এই মত সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত নহে। অনেক ভুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, চট্টগ্রাম নগর হইতে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জিলার মধ্যদিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে ঢাকা পর্য্যন্ত, তৎপর ঢাকা হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত এবং ঐ স্থান হইতে দক্ষিণদিকে কাটোয়া পর্য্যন্ত, পরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে সরিয়া বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়া বালেশ্বর নগর পর্য্যন্ত একরেখা কল্পনা করিলে, ঐ রেখাই পূর্ব্বে সমুদ্র তটছিল এমত অনুমিত হয়। তাঁহারা এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ ইহাও বলিয়া থাকেন

যে প্রাচীন কোন হিন্দু শাস্ত্রে দক্ষিণাংশস্থিত কোন স্থানের নামের উল্লেখ নাই। আর প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ভুগোলবিদ্ পণ্ডিতেরা ঐ রেখার উত্তর স্থিত গৌড়, রাজমহল, কাটোয়া অগ্রদ্বীপ, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি কতকগুলি নগরের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, যে বাণিজ্যার্থ অর্ণবপোত সকল ঐ সমুদয় স্থানে আগমন করিত। বিশেষতঃ সমুদ্র তট হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত স্তর সংস্থান প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলেও কাপ্তান লুইনের মতের পোষকতা করা যাইতে পারে না। এ প্রদেশের ন্যায় ইহার দক্ষিণদিকের ভুমি বালুকাময় নহে। আমাদের বিবেচনায় ইহার একমাত্র কারণ এই যে, পর্ব্বতান্তর্গত প্রস্তরগুলি বৃষ্টি ও জল প্রপাতের বেগে চূর্ণীকৃত হইয়া, নদীর জলের সঙ্গে সমভুমিতে অনবরত আনীত হইয়া, নানা প্রকার আটাল মাটী ও বালুকা-রূপে পুরাতন স্তর সমুদয়ের উপরে সংস্থাপিত হইয়াছে; এ প্রদেশের স্থানে স্থানে পুরাতন মৃত্তিকাও প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু নদী সমূহের তলভাগ, পার্শ্ব অথবা নিকটবর্ত্তী স্থানে ভূপৃষ্ঠোপরি কেবল নূতন মৃত্তিকা লক্ষিত হইয়া থাকে।

জল বায়ু।

কোচবিহারের জলবায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর নহে। নদ নদী সকল নিরবচ্ছিন্ন বালুকা ও প্রস্তর খণ্ডে পরিপূর্ণ থাকায় জল অতিশয় শীতল ও পরিষ্কার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বৎসরে তিন চারি মাসের অধিককাল গভীর ও প্রভাবশালিনী না থাকিলেও বার-মাসই কথঞ্চিৎ চলিতে থাকে। তাহা বদ্ধ জল নয়, স্রোত বিশিষ্ট এবং স্ফটিকের তুল্য পরিষ্কার। তন্নিকটবাসী জনসমূহ

ঐ জলদ্বারা পানাদিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। নদীর জল যে স্থানে ৪।৫ অঙ্গুলীর অধিক গভীর নহে সে স্থান অঙ্গুলি দ্বারা খনন করিলেই অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সকল স্থান নদী হইতে বহু দূরে অবস্থিত, তজ্জনপদবাসী লোকেরা আপন আপন বাটীতে অথবা গ্রামের মধ্যে যে যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন তথায় কূপ খনন করিয়া লয়। অল্প পরিমাণ খনন করিলেই জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জল পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, বৃহদায়তন দীর্ঘিকা বা অন্যান্য কৃত্রিম জলাশয় অপেক্ষা উল্লিখিত কূপজলই উৎকৃষ্ট। এই সকল গ্রাম্যকূপ মৃণ্ময় বা কাষ্ঠময় পাট অথবা ইষ্টক কিম্বা প্রস্তর দ্বারা রচিত হয় না। উহা এদেশে চুয়া নামে খ্যাত। বোধ হয় চোয়ান শব্দ হইতে চুয়া নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। বর্ষাকালে সমস্ত নদ নদীই সমধিক বেগশালিনী হইয়া পড়ে। এইকালে প্রায়ই হিমালয় পর্ব্বতে অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে নদীগর্ভ পূর্ণ থাকে ও জলস্রোত প্রবল বেগবিশিষ্ট হইয়া উঠে। এই সময়ে জল বালুকা মিশ্রিত হওয়াতে কিছুকাল না রাখিয়া পান করা যায় না।

কোচবিহারে উত্তরের বায়ু বিরল, দক্ষিণের বায়ু নাই বলিলেই বলা যায়। বোধ হয় গগনস্পর্শী হিমগিরি উক্ত উভয় বায়ু সঞ্চারের অন্তরায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগের বায়ু সমধিক প্রবল এবং পর্য্যায়ক্রমে প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত একাদিক্রমে পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ পূর্ব্ব বায়ু ভোগ করিলে গাত্র বেদনা ও কখন কখন জ্বর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পশ্চিম বায়ু বসন্তের প্রারম্ভে বহিতে আরম্ভ করে। এই বায়ুর প্রবাহ দ্বারা

শীতের তিরোভাব এবং গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়। গ্রীষ্মকালে পশ্চিম বায়ু কখন কখন অতিশয় উষ্মভাব ধারণ করে। চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত না হওয়াতে বাতাবর্ত্ত ও ঘূর্ণি বায়ু প্রায় দৃষ্ট হয় না।

সাধারণতঃ বিবেচনা করিতে গেলে কোচবিহারে শীত ও গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতু নাই। আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত শীত ও চৈত্র হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের অধিকার। চৈত্র এবং বৈশাখ মাসেও রাত্রিযোগে অল্প পরিমাণ শীত অনুভব হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ মাসে রোমজ বা কীটজ বস্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক করে। শীতকালে মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকাল হইতে বেলা আট ঘটিকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সূর্য্যোদয় অনুভব করা দুঃসাধ্য হয়। প্রাতে ভ্রমণ সচরাচর কষ্টকর ও পীড়াজনক হইয়া পড়ে। বসন্তকাল এস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প কাল স্থায়ী। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতু বসন্তের আদি ও অন্তকাল আপন আপন অধিকার ভুক্ত করিয়াছে। ফাল্গুনের অর্দ্ধ ও চৈত্রের অর্দ্ধ এই একমাসকাল বসন্তের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বসন্তের প্রধান চিহ্ন দক্ষিণ বায়ু এখানে নাই। শীতের শেষ এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভ ও আম্র বৃক্ষের মুকুলোদ্গম প্রভৃতি দ্বারা বসন্ত অনুভব করিয়া লইতে হয়। এস্থানে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু প্রায় সম সাময়িক। বৈশাখ মাস হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি দিনই বৃষ্টি হইয়া থাকে। ওদিকে হিমালয় হইতে ভূরি পরিমাণ জলরাশি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত নদ নদী প্লাবিত করিয়া দেয়। আবার মাঠ ঘাট সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর অবিরত বর্ষণশীল মেঘ প্রভাবে প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু এ

প্রদেশের উচ্চতা এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশের ক্রম নিম্নতানিবন্ধন ভূরি পরিমাণ জলরাশি কোন স্থানেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারেনা, একত্র হইবা মাত্রই দক্ষিণ প্রদেশে প্রতি নিয়তই সরিয়া যায়। বর্ষাকালে মৃত্তিকা এত অধিক আর্দ্র হয় যে তাহার উপর গমনাগমন দুষ্কর হইয়া উঠে। নিয়ত পাদুকা ব্যবহার না করিলে পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। এদেশের ভদ্র মহিলাগণও কাষ্ট পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাটীতে শয়ন করিলে নিশ্চয়ই পীড়িত হইতে হয়। এজন্য এদেশের আপামর সাধারণ সকলেই উচ্চে শয়ন করে। যাহাদের তক্তপোষ (চৌকি) কিংবা খাট প্রস্তুত করিবার শক্তি নাই তাহারাও বাঁশের মাঁচা করিয়া তদুপরি সচরাচর শয়ন করে। এই সময়ে এ প্রদেশের পতিত স্থান সমুহ নানাবিধ উদ্ভিদ্‌ ও গুল্মলতায় পরিপূরিত হয়। নদীতীর, কেশে ও জঙ্গলে অরণ্যানী হইয়া যায়। শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে অত্যন্ত বৃষ্টি হইলেও গ্রীষ্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব থাকে। গড়ে প্রতিবৎসর ১২৫.৩২ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া থাকে।

জানুয়ারি .৭ ফেব্রুয়ারী .৬ মার্চ্চ .৭৭ এপ্রিল ৭.৪২ মে ১৪.৪৫, জুন ৩৭.১৭, জুলাই ২৪.৫৬, আগষ্ট ২২.৪৩, সেপ্টেম্বর ১৬.৭৭, অক্টোবর ৪.১৫, নবেম্বর .১, ডিসেম্বর .২।

জীব জন্তু।

হিমালয় ও তন্নিম্ন প্রদেশস্থ যে অরণ্যানী পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তুর আবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত, তাহা কোচবিহারের অনতিদূরেই অবস্থিত। সুতরাং বাসোপযুক্ত স্থান পাইলেই

নানা প্রকার জীবজন্তু এস্থানে আসিয়া বাস করিবে আশ্চর্য্য কি? নানা জাতীয় ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, মৃগ, মহিষ অত্রস্থ অরণ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেশে, নল খাগড়া প্রভৃতি জঙ্গল বর্ষাকালে ও শীতের প্রারম্ভে যাবতীয় পতিত ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং ঐ সময়ে বন্য জন্তুরও অভাব থাকে না। কোচবিহারের পূর্ব্বোত্তর সীমানায় অনেক পতিত ভূমি আছে তথায় ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সচরাচর দেখা যায়। মেচ, গারো প্রভৃতি যে সকল বন্য জাতির চিরদিন জঙ্গলে বাস করা অভ্যাস তাহারা ব্যতীত ঐ সকল প্রদেশে অন্য লোক প্রায় বাস করিতে পারেনা। কোচবিহারে বন্য হস্তী দৃষ্ট হয় না। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ বিশিষ্ট অরণ্যানী এখানে নাই সুতরাং বন্য হস্তীর সমাগম অসম্ভব। এই রাজ্যের উত্তর সীমায় অত্যল্প ব্যবধানেই বন্য হস্তী দৃষ্ট হইয়া থাকে। গো, মেষাদি গৃহপালিত পশু বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও যেরূপ এখানেও সেইরূপ, তৎসম্বন্ধে কোনও তারতম্য লক্ষিত হয় না। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে যে সকল পক্ষী দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোচবিহারেও সচরাচর তাহাই দৃষ্ট হয়। টীয়াপাখী এখানে অতি সুলভ। বৃহৎ বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ মাত্রই টীয়াপাখীর আবাস স্থান। কবুতর, হাঁস, ও কুক্কুট গৃহপালিত পাখীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। হিন্দু মাত্রের বাটীতেই কবুতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। হাট ও বাজারে বহুবিধ কবুতর ও হংস ক্রয় বিক্রয় হয়। কবুতরের মাংস অনেক লোকেই সচরাচর ভক্ষণ করে; এবং স্বকপোলকল্পিত দেবদেবীর তুষ্টি সাধন জীবিত কবুতর দ্বারাই হইয়া থাকে। কোন রূপ বিপদে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকিলে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া গৃহস্থেরা কবুতর উড়াইয়া দেয়। এ স্থানের

প্রায় জঙ্গলেই ময়ূর পাওয়া যায়। অনেক পক্ষী বৎসরের সকল সময় এখানে অবস্থিতি করে না, শীতের আধিক্যের প্রারম্ভেই অনেক পক্ষী হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া কোচ-বিহারে আইসে। আবার কোচবিহারে শীত প্রবল হইলে দক্ষিণ দেশে গমন করে। মুনিয়া নামক এক জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী এখানে বর্ষার অনতি পূর্ব্বে বহু সংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পাখী দেখিতে অতি সুন্দর; ইহার পাখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বিন্দু বিশিষ্ট।

মৎস্য কোচবিহারে সুলভ নহে। এস্থানের অধিকাংশ নদ নদী বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস জল পূর্ণ থাকে, তৎপরেই শুষ্ক প্রায় হইয়া যায় সুতরাং নদীতে প্রায়ই মৎস্য থাকে না। পুষ্করিণীতে মৎস্য পোষিত ও সংরক্ষিত হইবার প্রথা এ প্রদেশে বড় প্রচলিত নাই। শীতকালে ধুবড়ী, খাওয়া প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক মৎস্য আনীত হয়। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এস্থানে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের নূতন মৎস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আচিম, ভোটখড়ি, গতা, গোটী, রামধুতুরা, বরলী, চোয়াতর, নাল্‌সা, ডকরা, কুর্সরি, মুগরুস্‌, উরুয়া, নালিশ, পুঠীতর, শীলচোকা, পীঠকাটা, নাওয়ানি, ছিপরা, পোগাল, হাড়িখাই, তোয়া, চাকা।

বর্ষাকালে অন্যান্য দেশাগত শুষ্ক মৎস্য এদেশীয় ইতর লোকে যথেষ্ট পরিমাণ আহার করে। এদেশে মৎস্যের এক প্রকার চূর্ণ পিণ্ডাকারে পাওয়া যায়, এদেশীয় ইতর লোকেরা উহা মোলা বলে এবং আগ্রহের সহিত আহার করে।

বৃক্ষ।

এই রাজ্যে বৃহদায়তনের নানা জাতীয় বৃক্ষ বিশিষ্ট কোন অরণ্যানী দৃষ্টিগোচর হয় না। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এ রাজ্যবাসী প্রজাগণের বৃক্ষাদিতে কোন স্বত্ব ছিল না, সুতরাং প্রজাগণ বৃক্ষাদি রোপণে মনোযোগ দিতনা। আম্র, কাঁঠাল এবং সুপারি বৃক্ষই এখানে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। বাঁশ বাগান এদেশীয় প্রজার বিলক্ষণ আয়ের সম্পত্তি। বাঁশ কোচবিহারবাসিগণের বহুল প্রয়োজন সাধন করে। বাড়ী ঘর, শয়নের খাট, বসিবার চৌকি, দ্রব্যাদি বহনের টুকরি, বিছানার দরমা, তৈল ও অন্যান্য জলীয় বস্তু রাখিবার ভাণ্ড, পাকের কাষ্ঠ, ও যষ্টি, একমাত্র বাঁশের সাহায্যেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার মাকলা বাঁশের প্রধান গুণ এই যে তাহাতে ঘুণ ধরেনা; সুতরাং অন্যান্য স্থানের বাঁশের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে যেমন কতকদিন পর্য্যন্ত বাঁশ জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, এখানে তাহার প্রয়োজন করে না। অন্যান্য প্রকারের বাঁশও এখানে পাওয়া যায়। মফস্বলে মাকলা বাঁশ গড়ে শতকরা তিন টাকা এবং রাজধানীতে ৫৷৹ হইতে ৬৲ টাকা দরে বিক্রী হয়।

সুপারি বৃক্ষ এখানে বহুসংখ্যক দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ফল বড় ভাল হয় না। শুষ্ক সুপারি এ দেশীয়েরা প্রায়ই ব্যবহার করেনা। কাঁচা সুপারি জলে ভিজাইয়া পরে মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া রাখে। অভ্যাসের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সুপারি মাটীর নীচে প্রোথিত থাকিয়া যতই দুর্গন্ধ

বিশিষ্ট হয়, ততই মানব মণ্ডলীতে তাহার সমাদর বৃদ্ধি পায়। দুর্গন্ধ বিশিষ্ট কাঁচা সুপারি পয়সায় ২।৩টী করিয়া বিক্রী হয়। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে যেরূপ পান আছে সে জাতীয় পানের চাষ এখানে অতি বিরল। এখানে আম্র ও সুপারি বৃক্ষের উপর একরূপ বন্য পান জন্মিয়া থাকে উহার নাম গাছপান। যে স্থানে সুপারি বৃক্ষ আছে পানের গাছ তাহার উপর প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এ দেশের সমুদয় লোকেই এই গাছপান ব্যবহার করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে পানের আবাদও হয়। বৃহদায়তন আম্র বৃক্ষের সংখ্যা এখানে অধিক বটে, কিন্তু আম্র একরূপ অখাদ্য বলিলেই হয়। আম্র মাত্রই প্রায় টক ও কীটপূর্ণ। এখানে এক প্রকার কাঁচা মিঠা আম জন্মে তাহাকে ভোগরাম বলে। অপক্ব অবস্থায় এই আম খাইলে টক লাগে না, পাকিলে পান্‌সা হইয়া যায়। কাঁঠাল গাছ এখানে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; যথেষ্ট ফল হয় এবং ফল বিশেষ সুখাদ্য। শিশু গাছ এ প্রদেশে বৃহদায়তন বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোচবিহারে শালবন অতি বিরল। কয়েকটী মাত্র শালবন দৃষ্ট হয়; উত্তর তেলধার নামক স্থানে দুইটী তাহাতে ন্যূনাধিক ১৬০০০ বৃক্ষ আছে। সুপ্রসিদ্ধ গোসানিমারীর শালবনে অন্যূন ৩০০০ বৃক্ষ হইবে। ভৈষকুচী আউটপোষ্টের অধীন গারদের হাটের পূর্ব্ব ও উত্তরাংশে চকচকা ও খাগড়াবাড়ী নামক তালুকে দুইটী শালবন আছে, তাহার প্রত্যেকটীতে সহস্র শাল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শালবন একবার এক স্থানে হইলে ক্রমে ক্রমে স্বীয় দলবল বৃদ্ধি করিতে থাকে,

প্রতি বৎসর নূতন নূতন চারা জন্মিবায় ক্রমেই বনের আয়তন বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় উল্লিখিত বৃক্ষ সমূহের মধ্যে ১৫৯ জাতীয় বৃক্ষ এখানে দেখা গিয়া থাকে।

মান্যতম ডিপুটী কমিসনর স্মিথ সাহেবের যত্নে এরাজ্যের রাজ পথের পার্শ্বে অনেকগুলি শিশু বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। অনেক বৃক্ষই শৈশবাবস্থায় আছে। অন্যূন ২৫০০ শিশু বৃক্ষ রাজপথের পার্শ্বে দেখা যায়। সম্প্রতি শিশু বৃক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। রাজধানীর এক ক্রোশ পশ্চিম ও দুইক্রোশ দক্ষিণদিকে দুই স্থান মনোনীত করিয়া তন্মধ্যে শিশু বৃক্ষের চারা সংরক্ষিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত নীলকুঠীর নিকটেও একস্থানে চারা রক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০০০ চারা রক্ষিত হইতেছে। শিশু বৃক্ষের আয়তনও এদেশে বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১৮৭২-৭৩ সনে যে বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে তাহা ১৮৮২ সনে আয়তনে গড়ে ২২ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩ ফুট ১ ইঞ্চি বেষ্টন বিশিষ্ট হইয়াছে। গড়ে প্রতিবৎসর লম্বায় ২ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং বেষ্টনে ৪ ইঞ্চি বৃদ্ধি পায়।

নদীর বিবরণ।

১। তিস্তা বা ত্রিস্রোতা তিব্বত দেশ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে সম্মিলিত হইয়াছে। এ রাজ্যের উত্তর পশ্চিমস্থ বক্সীগঞ্জ নামক স্থানে রাজ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, দক্ষিণ পূর্ব্ব বাহিনী হওত, মেকলীগঞ্জের নীচ দিয়া যাইয়া,ঝাড়

সিংহেশ্বর নামক স্থানে এ রাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে। ত্রিস্রোতা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ১৫৬॥ ক্রোশ, তন্মধ্যে তিব্বত দেশে ১০ ক্রোশ, শিকিম রাজ্যে ৪৮॥ ক্রোশ, শিকিম ও ভুটানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ৫ ক্রোশ, ভুটান ও দারজিলিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ১০ ক্রোশ, ভুটান ও দিনাজ পুরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ৫ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া দিনাজপুর জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রবেশের স্থান হইতে ১৫ ক্রোশ ব্যবধানে সমদ্বিধারে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, একধার দক্ষিণ পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছে, উহার নাম আত্রাই, অপর ধারের নাম তিস্তাই রহিয়া গিয়াছে। দ্বিধারের সঙ্গম স্থান হইতে ২॥ ক্রোশ ব্যবধানে এ রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ৪ ক্রোশ প্রবাহিত হওত, রঙ্গপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; উক্ত জেলায় ৫৫ ক্রোশ প্রবাহিত।

তিস্তানদীতে বৃহৎ বৃহৎ চরা আছে, ইহার উত্তর ভাগ ক্রমশঃই শিলাখণ্ডে পরিপূরিত। ইহার জল পরিষ্কার, শীতল ও স্বাস্থ্যকর। কালীপুরাণে কথিত আছে, ভগবতী শিবভক্ত জনৈক অসুরের সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অসুর অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসাতুর হইয়া স্বীয় উপাস্যদেব মহাদেবের নিকট পানীয় প্রার্থনা করাতে তিনি ভগবতীকে পানীয় প্রদানের আদেশ করেন। ভগবতী অগত্যা আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য হইয়া হৃদয়দেশ হইতে তিনটী জলধারা বাহির করিয়াছিলেন; তাহাতেই এই নদীর নাম ত্রিস্রোতা হইয়াছে। তৃষ্ণা নিবারণার্থ নদীর উৎপত্তি হওয়াতে উহার অপর নাম তৃষ্ণা বলিয়াও উল্লিখিত আছে। শাখানদী বুড়া তিস্তা, বক্সীগঞ্জের নিকট

হইতে নির্গত হইয়া, সামিলাবসের নিকট এরাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহার তীরে দেওয়ানগঞ্জ।

২। সিংমারী, হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ক্ষেত্তর অন্তর্গত মোরঙ্গায়হাট গ্রামের নিকট এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গাপুর নামক গ্রামে ধল্লা বা বড় তোর্ষার সহিত মিলিত হইয়াছে, অনন্তর রঙ্গপুরে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। সঙ্গমস্থলকে বাঘুয়ার মোহনা বলে। এই নদী কোচবিহারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে খ্যাত। যথা—মুজনাই, দানখানা, জলধাকা, মানসাই। প্রধান প্রধান উপনদী যথা—(ক) ধল্লা, পানিশালা নামক গ্রামে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জলপাইগুড়ীর অন্তর্গত পাটগ্রামের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া, মহিষমুড়ীর নিকট পুনরায় এরাজ্যে প্রবেশ করতঃ, শিবপুর বাউরার নিকট সিংমারীতে পতিত হইয়াছে। (খ) সুটুঙ্গা, কামাতচাঙ্গারাবান্ধা নামক গ্রামে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মাথাভাঙ্গার দক্ষিণে সিংমারীতে পতিত হইয়াছে।

৩। বড়তোর্ষা বা ধল্লা। হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া লাফাবাড়ী নামক গ্রামে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, পরে দুর্গাপুরের নিকট সিংমারীর সহিত মিলিত হইয়া, মোগলহাটের নিকট এরাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে। উপনদী টানাটানী, ভোটান্ত প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া খট্টিমারীর দক্ষিণদিকে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। শাখানদী বুড়া তোর্ষা, কানিবিল নামক স্থানের উত্তরভাগে বড় তোর্ষা হইতে নির্গত হইয়া, ভেলাকোপা হাটের দক্ষিণদিকে কালজানীতে পতিত হইয়াছে।

কোচবিহার নগর এই নদীতীরে অবস্থিত। ইহার উপনদী ঘড়ঘড়িয়া, শিকিরহাটের নিকট এরাজ্যে প্রবেশ করতঃ মহিষবাথানের পূর্ব্বদিকে বুড়া তোর্ষায় পতিত হইয়াছে।

৪। কালজানী ভোটানের পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বাক্সার নীচ দিয়া প্রবাহিত হওত, খোল্টানামক স্থানে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ঝাউকুঠীর নিকট এরাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে। উপনদী যথা—(ক) ছোট গদাধর, খাসবস তালুকের নিকট এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিলিখুড়ির অনতিদূরে কালজানীতে পতিত হইয়াছে। (খ) বড় রায়ডাক, ঘোটীমারীর নিকট এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিলিখুড়ির নিকট কালজানীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর শোণকোষ নাম ধারণ করতঃ বহুদূর গমন করিয়াছে এবং বড় গদাধরের সহিত মিলিত হইয়া ২।৩ মাইল প্রবাহিত হওত, মুনখাওয়ার নিকট ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। দীপোনদী চিকলিগুড়ী নামক স্থানে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া খেড়বাড়ীর নিকট বড় রায়ডাকে পতিত হইয়াছে।

৫। বড় গদাধর, এরাজ্যের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া, ছাটভলকা নামক তালুকের পূর্ব্বদিকে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, কতিপয় মাইল মাত্র এরাজ্যে প্রবাহিত হওত, বক্সীগঞ্জ হাটের পূর্ব্বদিকে এরাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়াছে। উপনদী ছোট রায়ডাক, রামপুরহাটের উত্তরে এরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সাহেবগঞ্জ হাটের দক্ষিণে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। তাহাদিগকে উল্লিখিত কোনও নদীর সহিত মিলিত হইতে দেখা যায় না। তাহাদের উৎপত্তি ও পতন স্থান নির্ণয় করাও সহজ নহে। তন্মধ্যে সানিয়া জান, চেনাকাটা, গীদারি, ছোটমানসাই, সন্ন্যাসীকাটা প্রভৃতি প্রধান।

শিল্প।

শিল্পকার্য্যে কোচবিহার-বাসিগণ অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। কেবলমাত্র দুইটী বিষয়ে ইহাদের শিল্প নৈপুণ্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম এণ্ডিকাপড় দ্বিতীয় মেকলী। এণ্ডিনামক একরূপ কীট আছে, ভেরেণ্ডার পত্র আহার করাইয়া তাহার শরীর পোষণ করে। পনর দিবস মধ্যেই কীটগুলি বড় বড় হইয়া দেহ বিনির্গত সূত্র দ্বারা বাসা নির্ম্মাণ করে। বাসাগুলি সূত্রময়, কীটগুলি রেসম কীটের ন্যায় আপন আপন সূত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। পরে বাসাগুলি গরম জলে সিদ্ধ করতঃ কীট মরিয়া গেলে, বাসা হইতে সূত্র বাহির করিয়া লয়; এই সূত্রদ্বারা একরূপ মোটা বস্ত্র বয়ন করে তাহাকেই এণ্ডি বলে। এণ্ডিকাপড় সুদৃঢ়, মোটা, দীর্ঘকাল স্থায়ী ও শীত নিবারক। যতই ধৌত করা যায় ততই সৌবর্ণ ও কোমলতা প্রাপ্ত হয়। কোচবিহারস্থ কৃষকগণের মধ্যে যাহারা বাটীর দেওয়ানিয়া অর্থাৎ কর্ত্তা তাহাদের গাত্রে এণ্ডিকাপড় প্রায়ই দৃষ্ট হয়। মেকলী কোষ্ঠা দ্বারা প্রস্তুত হয়। সচরাচর যেরূপ চট পাওয়া যায় ইহা

তাহা হইতে সুক্ষ্ম ও পরিষ্কার। এদেশের ব্যবহারোপযোগী কয়েক প্রকারের কাপড়ও এদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বলরামপুরের ভদ্রমহিলাগণ যে সকল বস্ত্র বয়ন করেন তাহা অতি উত্তম। এদেশীয় লোকে বাঁশের দ্বারা অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাহাতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করে।

মহরমের সময় যে সকল ডাহা (চৌকি) প্রস্তুত হয়, তাহাতে কাগজের যে সকল কারুকার্য্য দেখা যায়, তাহা অতিশয় সুদৃশ্য।

এদেশে কুম্ভকারের সংখ্যা অতি অল্প। মৃৎপাত্র প্রস্তুত করার উপযোগী মৃত্তিকাও সচরাচর ঘটে না। যে সকল মৃৎপাত্র প্রস্তুত হয় তাহাও নিতান্ত ভঙ্গপ্রবণ। দক্ষিণদেশ হইতে অনেক মৃৎপাত্র এদেশে আনীত হইয়া থাকে। এদেশে এমন মৃত্তিকা প্রায়ই দেখা যায় না, যদ্দ্বারা ভাল ইষ্টক প্রস্তুত হইতে পারে। অল্প কয়েক স্থানের মৃত্তিকা মাত্র ইষ্টক নির্ম্মাণের উপযোগী।

কয়েক বৎসর হইল এখানে একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এদেশীয় অনেক লোক বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া কথঞ্চিৎরূপে চৌকি, চেয়ার, টুল, মেজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। অদ্যাপি কেহ তদ্বিষয়ে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই। বিদ্যালয়টী আরও কয়েকদিন স্থায়ী হইলে ভাল সুত্রধরের অভাব থাকিবে না, ভরসা করা যাইতে পারে।

বাণিজ্য।

কোচবিহার হইতে যে সকল উৎপন্ন দ্রব্য বাণিজ্যার্থে স্থানান্তরে প্রেরিত হয় তন্মধ্যে তামাক, কোষ্ঠা, সর্ষপ-তৈল এবং ধান্যই প্রধান। ঐ সকল বস্তু এরাজ্যে ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেশের লোকের প্রয়োজন সাধিত হইয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তাহাই স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। নানাবিধ বস্ত্র, লবণ, নানা প্রকারের বাসন, শর্করা, মসল্লা এমন কি এদেশীয় লোকের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বস্তুই, ন্যুনাধিকরূপে দেশান্তর হইতে বাণিজ্যার্থে আনীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এস্থানে যে সকল বস্তু আমদানী ও রপ্তানি হইত তাহা নৌকাযোগেই হইত। বর্ত্তমান সময়েও তামাক, তৈল এবং অল্প পরিমাণ কোষ্ঠা এস্থান হইতে নৌকাযোগে সেরাজগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থলে রপ্তানি হইয়া থাকে। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে স্থাপন অবধি অধিকাংশ কোষ্ঠা, হল্‌দিবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেসন দিয়া প্রেরিত হয় এবং কাপড় ইত্যাদি রেলওয়ে যোগে এখানে আমদানী হইয়া থাকে। সংবৎসরে ন্যূনাধিক পঞ্চদশ লক্ষ টাকার উৎপন্ন দ্রব্য দেশান্তরে প্রেরিত হয় এবং যে সকল দ্রব্য এদেশে আনীত হয় তাহার আনুমানিক মূল্য নয় লক্ষ টাকা।

রপ্তানি		আমদানী	
তামাক	৭০০০০০	কাপড়	৫০০০০০
কোষ্ঠা	৪০০০০০	লবণ	১৫০০০০
সরিষা ও তৈল	২০০০০০	অন্যান্য	২৫০০০০
ধান্য ও চাউল	১০০০০০		
অন্যান্য	১০০০০০		৯০০০০০
	১৫০০০০০		

১৮৭২ সনে আনুমানিক মূল্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সম্প্রতি রেলওয়ে হওয়াতে পূর্ব্ব হইতে দ্বিগুণতর কোষ্ঠা রপ্তানি হইয়া থাকে। কাপড়ও অধিক আমদানী হয়।

বাণিজ্য কার্য্য প্রধানতঃ ভিন্ন দেশীয় লোক দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে যোধপুর, বিকানীর, মুরশীদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কাঁইয়া মহাজনই অধিক। রাজধানীতে ইহাদের প্রধান আড্ডা এবং মফঃস্বলের স্থানে স্থানে তাহার শাখা প্রশাখা আছে। বাণিজ্য স্থানের মধ্যে কোচবিহার নগরই প্রধান। এতদ্ব্যতীত বলরামপুর, চওড়া, গোবরাছাড়া, তুফানগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, চাঙ্গারাবান্ধা, ভেলাকোপা, লাউকুঠী, মহিষখুচী, প্রভৃতি স্থানেও প্রচুর পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এদেশের বিক্রয় কার্য্য প্রধানতঃ হাটেই সম্পন্ন হয়। দেশীয় সমস্ত লোক আপন আপন উৎপন্ন দ্রব্য নিকটস্থ হাটে আনিয়া বিক্রয় করে এবং নিম্ন শ্রেণীর মহাজনেরা কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত, সচরাচর হাটে আনিয়া বিক্রয় করে, এজন্য কোচবিহারে হাটের সংখ্যা অধিক। পূর্ব্বে রাজধানীর ৫৷৷০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে কালজানী গ্রামের নিকটে, উক্ত নামধেয় নদীর তীরে চৈত্রমাসের অশোকাষ্টমীতে গদাধরের মেলা নামক একটীমাত্র মেলা হইত। তথায় তিন দিবস মেলা থাকে এবং বহুতর যাত্রী স্নানার্থ-সমাগত হয়, কিন্তু সম্প্রতি দেওয়ানগঞ্জ, শীতলখুচী, দীনহাটা, হলদিবাড়ী নামক স্থানে আরও চারিটী মেলা হয়। এই সকল মেলাতে ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বহুতর জিনিস ক্রয় বিক্রয় হয়। নদী, খালে জলের অল্পতা

নিবন্ধন নৌকার পরিবর্ত্তে গরুরগাড়ী, বলদ, ঘোটক দ্বারাই বিক্রেয় দ্রব্যাদি একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মুটিয়ার সংখ্যাও অল্প; প্রায় সকল গৃহস্থেরই ঘোড়া এবং বলদের গাড়ী আছে। অধিকাংশ স্থলেই ঘোটক বা বলদ দ্বারা বিক্রয় দ্রব্য বাজারে নীত এবং ক্রীতবস্তু বাড়ীতে আনীত হইয়া থাকে।

কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য।

এখানকার কৃষিকার্য্যে শারীরিক পরিশ্রম অপেক্ষা কৌশলেরই বিশেষ প্রয়োজন। মৃত্তিকা স্বভাবতঃই ধূলিবৎ, সুতরাং কর্ষণ কার্য্যে অধিক পরিশ্রম লাগে না। ধান্য ও তামাক কোচবিহারের লোকের প্রধান অবলম্বন। কি প্রণালীতে তাহা উৎপাদিত হয় তদ্বিবরণ এই প্রস্তাবের উপসংহার ভাগে প্রকটিত হইল। কোষ্ঠা, সরিষাও অল্প আয়ের দ্রব্য নহে। লোকেরা বহু যত্ন পূর্ব্বক উৎপাদন করে। ইহাদের উৎপাদন প্রণালী অন্যান্য দেশের উৎপদান প্রণালী হইতে বিশেষ পৃথক নহে। কাজেই তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেলনা। খেশারী, মুসরি, মাসকলাই, ঠাকুরীকলাই, মটর, অরহর, তিল, গোলআলু, চিনা, কাউন, গম, হরিদ্রা, আদ্রক প্রভৃতি এদেশের অনেক স্থানেই জন্মে। এখানে সটীও জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বে উপাদেয় তিক্ষুর প্রস্তুত জন্য বহুল পরিমাণ সটী স্থানান্তরে প্রেরিত হইত। এখানকার ভুমির

অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় বিশেষ যত্ন করিলে চা ও কুসুম ফুল জন্মিতে পারে।

কোচবিহারে প্রায় একশত প্রকারের অধিক ধান্য উৎপন্ন হয়। এই সমুদায় দুই জাতিতে বিভক্ত, বিতরি অর্থাৎ আউষ অথবা আশু এবং হেঁউতি অর্থাৎ আমন অথবা শালি এই সমস্ত ধান্যের নাম নিম্নে লিখিত হইল। হেঁউতি যথা চন্দ্রভোগ, কাটারীভোগ, কেঁওয়াভোগ, বিন্নাফুলভোগ, তুলসীভোগ, বাউইভোগ, জগন্নাথভোগ, মহেশভোগ, দশভোগ, রুক্মিনীভোগ, রছুলভোগ, ক্ষিরসা-ভোগ, কুমারভোগ, বলরামভোগ, কৃষ্ণভোগ, লালভোগ, বাঙ্গালভারী, হারপী, আচাইভোগ, চিনিশঙ্কর, ইন্দ্রসাইল, দ্বিচল, বুড়াবন্নী, হরিশঙ্কর, কানাইবাসী, দ্বারিকাসাইল, চিনিচক্রভোগ, গুণ্ডরিভোগ, দুধপাখারি, সুবর্ণযশোয়া, ছোট যশোয়া, বড়লাউয়া অথবা হাতীরদাঁত, ছোট লাউয়া, বড় যশোয়া, মানসিরা, দুধকলম, ছোট গাজিয়া, বড় গাজিয়া, পানীসাইল, নারিকেলঝোপা, শ্যামরণ, ছোটফুলপাকরি, বড়পানাতি, ছোটপানাতি, বড়ফুলপাকরি, কাঁতসাইল, খাঙ্গারমাও, ধলাবচী, লালবচী, কালবচী, ছোটঢেপা, বেঁত, হলদিজাম, রাঙ্গালদাড়ী, লোহাডাঙ্গা, বাসডাঙ্গা, ডাঙ্গবন্নি, ফুলগাজিয়া, বগাঝুল, শৈলঢেপা, সিঙ্গরা, জলঢেপা, ছোটচাপা, আমলা, চেমসী, পুরপি, জঙ্গিয়া, গোবা, আম-ঝুকি, বোয়াপাকুরি, অমলাকাসা, কেশববুচী, কাদবচী, জাপেবচী, গুঞ্জরীবচী, সেওরাজ, কাকুয়া, কটদনা, চিকিরাজবন্নি, আসন্নরা, তারাপাকরি, কালবন্নি, গোতোমাগুরী, মুরিয়াবচী, পয়রাযশোয়া, পুইয়া-

বচি, নারিয়াবচী, কালাধানী, ডাঙ্গারাণী, ললিতভোগ, সাজানি।

বিতরি যথা ঃ চাঁপাল, কাশিয়াগঞ্জের, পরসী, গাঠিয়া-ভুমরা, চেঙ্গভুমরা মুরলীভুমরা, কালখুকরি, ঘুসরি, নীলাজী, কাচানালী, বৈলবায়াসী, বিনিখোঙ্গরা, কালা-ভুমরা, ডাইকাসাইল, ধলকাচাই, ভালাই, খইরী, ধারিয়া, গড়িয়া ধান্য, রাঙ্গানামী, বীরমান্দনী, ছাইতানভুমরা, ছরিণ কাজলী, শৈলপনাই, চতুরুণ, পপরভাঙ্গ, কাইনন, বড়চাপলা, নোয়াসিদার।

বিতরি ধান্যের কৃষি বৈশাখ মাসে আরম্ভ হয়। ক্ষেত্রে উত্তমরূপে ছয়বার হলদ্বারা কর্ষণ করিয়া ও চারিবার মই-দ্বারা চূর্ণ ও সমান করতঃ ছয় অঙ্গুলী পর্য্যন্ত ধূলিবৎ করিয়া ধান্যের বীজ বপন করে। ১০।১২ দিনে বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারা ছয় অঙ্গুলী উচ্চ হইলে আর একবার মই দেয়। জ্যৈষ্ঠমাসে পাসন দ্বারা ক্ষেত্রের তৃণ পরিষ্কার করিয়া দেয়। ধানের গাছ গড়ে দুই হাত লম্বা হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসের শেষ ও শ্রাবণ মাসে ধান্য কর্ত্তন করে। এক জাতীয় নিকৃষ্ট বিতরি ধান্যের কৃষি ফাল্গুণ মাসে বপন করিয়া জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে কাটে। গাছ হইতে ধান পৃথক করিতে গবাদিদ্বারাই করা হয়। মনুষ্যেরা পাদ্বারা পেষণ করে না।

হেঁউতি দ্বিবিধ রোয়া অর্থাৎ রোপিত, বোয়া অর্থাৎ বপন করা। রোয়া শালি ধান্যের বীজ কৃষকেরা দুই প্রণালীতে উৎপাদন করিয়া থাকে। তলুয়া ও নেওয়চা; তলুয়া চৈত্র মাসের প্রথমে কোন এক শুষ্ক ক্ষেত্রে চারি-

বার হলের দ্বারা চাষ করিয়া দুইবার মই দ্বারা উত্তমরূপে ধূলিবৎ করতঃ বীজ বপন করে। ৮।১০ দিবসের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। আষাঢ় মাসে এই চারা সকল পৃথক ক্ষেত্রে রোপণ করে।

নেওয়চা জৈষ্ঠ মাসের প্রথমে এক বৃষ্টি হইলে কোন এক ক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে আলি বাঁধিয়া চাষ ও মইদ্বারা কর্দ্দম করতঃ বীজ বপন করে ও ২।৩ দিবসের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। চারা সকল আষাঢ় মাসের শেষ কি শ্রাবণ মাসের প্রথম পর্য্যন্ত পৃথক ক্ষেত্রে রোপিত হয়। চারা উৎপাদনের দ্বিবিধ প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে। এখন চারা সকল কিরূপে উঠাইয়া অন্য ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয় তদ্বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে। যে ক্ষেত্রে চারা সকল রোপণ করিতে হইবে প্রথমতঃ সেই ক্ষেত্রের চতুঃ-পার্শ্বে আলি বাঁধিয়া বৃষ্টির জল বদ্ধ করিয়া রাখে, ক্ষেত্রটী সম্পূর্ণ জলপূর্ণ হইলে হলদ্বারা প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পর্য্যন্ত ভুমি কর্ষণ করিয়া, মই দ্বারা কর্দ্দমময় ভূমি সমান করিয়া ক্ষেত্রস্থ তৃণাদি পচিয়া সার হইবার নিমিত্ত ১০।১২ দিন ঐ ভাবেই রাখিয়া দেয়; পরে হলের দ্বারা বারম্বার কর্ষণ ও পদদ্বারা দলন করে। মৃত্তিকা ও জল উত্তমরূপে মিলিত ও নিম্নবর্ত্তী ভূভাগ অর্দ্ধহস্ত পরিমাণে কর্দ্দমাকারে পরি-ণত হইলে, তলুয়ার চারা সমস্ত পাসন বা হস্তদ্বারা এক একটী করিয়া এবং নেওয়চার চারা সমস্ত হস্ত দ্বারা বহু-সংখ্যক একত্রে উত্তোলন করিয়া, সমস্ত চারার গুঁড়ি ঝাড়িয়া কি ধৌত করিয়া বড় চারার অগ্রভাগ ছেদন করতঃ অর্দ্ধহস্ত অন্তরে অন্তরে রোপণ করিয়া যায়। কৃষকেরা

এই সমস্ত কার্য্য এতদ্রুত নিষ্পাদন করে যে, কোন বিদেশীয় লোক তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হয়। ধান্যের গাছ ১৷৹।২ হস্ত উচ্চ হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ধান্য কর্ত্তন করে।

বোয়া হৈমন্তিক ধান্য নিকৃষ্ট। চৈত্রমাসের শেষ অথবা বৈশাখ মাসের প্রথমে নিম্নভূমি কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে হল ও মইদ্বারা পাইট করিয়া বীজ বপন করে। চারি পাঁচ দিবসের মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত হয় পরে বৃষ্টির আধিক্যে গাছগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই বড় হয়। এই গাছ ৮৷৯ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ১। বা ১॥ হস্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিয়া থাকে।

তামাকের বিবরণ।

কোচবিহার প্রদেশে তামাক উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করে। কোচবিহারের পশ্চিম দক্ষিণাংশে উৎকৃষ্ট তামাক হয়। যে কয়েক জাতীয় তামাক এখানে উৎপন্ন হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।—

নাম	পত্রের পরিমাণ।
১। চামা বা কুলাপাতি	২ কি ২॥৹ হাত দীর্ঘ ১ হাত প্রস্থ।
২। শকুনি চামা	ঐ অবয়ব অত্যন্ত পুরু ও পত্রের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চ।
৩। দাড়াইচ মেণী	২॥৹ হাত দীর্ঘ ১ হাত প্রস্থ।
৪। বড়মেণী	ঐ অবয়ব অত্যন্ত পুরু ও সমান।
৫। ছোটমেণী	১৸৹ কি দুই হাত দীর্ঘ ও ঐ প্রস্থ গোলাকার এবং উভয় পার্শ্ব উচ্চ।

৬।	পটুয়াখুলী	২॥ দীর্ঘ একহাত প্রস্থ পুরুও সমান।
৭।	ভেলেঙ্গী	২ হাত দীর্ঘ ১ হাত প্রস্থ।
৮।	সিন্দুরখটুয়া	১ হাত দীর্ঘ আধ্‌হাত প্রস্থ লালবর্ণ।
৯।	ঢাড্ডি	১।০ হাত দীর্ঘ একহাত প্রস্থ।
১০।	নাওখোলা	২।২॥ হাত দীর্ঘ ১ হাত প্রস্থ।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার তামাকের কৃষির নিয়ম প্রায় একই প্রকার। শ্রাবণ মাসের শেষে কি ভাদ্র মাসের প্রথমে বীজ বপন করে। চারা ৩।৪ অঙ্গুলী উচ্চ হইলে বৈকালে জল সেচন করে। অধিক বৃষ্টি হইলে চারা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় চারাক্ষেত্রে বৃষ্টি না পড়িতে পারে এই অভিপ্রায়ে ক্ষেত্রের উপরে এক ছাউনী করে। চারার প্রথম পত্র উদ্গত হইলে কৃষকেরা তাহাকে সোণাকানী কহে। কিঞ্চিৎ বড় হইলে ইন্দুরকানী তদপেক্ষা বড় হইলে টাকাপাতী এবং অধিক বড় হইলে পানাপাতী কহে। যে ক্ষেত্রে চারা রোপণ করিতে হয় তাহাতে চৈত্রমাস হইতে কৃষকেরা গোময় ও অন্যান্য সার নিক্ষেপ করিতে থাকে। আশ্বিন মাসে অর্দ্ধ হস্ত পর্য্যন্ত গভীর করিয়া চাষ করে এবং মই দ্বারা ভূমি ধূলিবৎ করিয়া ফেলে পরে সমান্তর ভাবে প্রায় ৩।৪ হস্ত অন্তর চারা রোপণ করে। চারা রোপণ করিয়া মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হয় এবং দুই সারির মধ্যে কয়েক বার চাষ করিতে হয়, পৌষ মাসের শেষে এবং মাঘ মাসের প্রথম ভাগে গাছ বড় হইলে নীচের পাতাগুলি ছিড়িয়া ফেলে এবং শুকাইয়া রাখে। এই গুলিকে বিষপাতা বলে, ইহা ভাল তামাকের সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রী করে। কয়েকটী মাত্র

বড় পাতা রাখে এবং গাছের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহার পর আর চাষ দিতে হয় না। গড়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিশবার চাষ ও মই দেয়। চৈত্র মাসে পাতাগুলি কিছু পীতবর্ণ হয় এবং তখনই কর্ত্তনের সময়; প্রাতঃকালে কর্ত্তন করে, এবং রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বৈকালে বাঁশের চটিদ্বারা সমদীর্ঘ চারি চারিটী পত্র একত্র বাঁধিয়া মাঠে ফেলিয়া রাখে। পরে পৃথক এক অন্ধকারময় ঘরে বংশ শলাকা সকল উপর্য্যুপরি ঝুলাইয়া তাহাতে ঐ তামাক পত্রের আটী অসংলগ্ন ভাবে ঝুলাইয়া রাখে কয়েক দিবস পরে নামাইয়া স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখে।

কোচবিহারের বিশেষতঃ গোসানিমারী, আদাবাড়ী, পানিগ্রাম, বারবাঙ্গলা প্রভৃতি স্থানের তামাক রঙ্গপুরের তামাক হইতে কোন অংশেই অপকৃষ্ট নহে, যদিচ হর্টিকাল চারেল সোসাইটীর কোন কোন মেম্বর প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে রঙ্গপুরের তামাক ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এ অঞ্চলের তামাকের একমাত্র দোষ এই যে, ইহা ইউরোপীয়দিগের ব্যবহারে বড় লাগেনা। কারণ ইহাতে উত্তম চুরট প্রস্তুত হইতে পারেনা, ইহার পাতাগুলি ভারী। ২।৩ বৎসর অতীত হইল মাথাভাঙ্গার অন্তঃপাতী কাউয়ারডারা নামক স্থানে আমেরিকীয় এবং স্পেনীয় প্রণালী অনুসারে তামাক জাত দেওয়া হইয়াছিল এবং আবাদও করা হইয়াছিল, তাহাতে যে তামাক হইত তাহা নিতান্ত উৎকৃষ্ট ও ইয়ুরোপীয়দিগের ব্যবহার যোগ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ব্যয় বাহুল্য বিধায় সেই কার্য্য সম্প্রতি স্থগিত আছে।

ভূমিবিভাগ ও ভূমির অধিকারিত্ব।

ভূম্যাধিকারী সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশীয় বন্দোবস্ত সমুহের ন্যায় জটিল নহে। ভূমির স্বত্ববান্ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই এই বন্দোবস্ত সুবিধা-জনক। প্রত্যেকের স্বত্ব আইন ও দেশীয় আচার ব্যব-হারে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে এবং তাহা সহজে নির্ণয় করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান বন্দোবস্ত ১২ বৎসরের জন্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই বন্দোবস্ত রাজা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। সকল পাট্টার ম্যাদ ১২ বৎসর সম্পূর্ণ হয় নাই, কারণ সকল পাট্টা এক সময়ে প্রদত্ত হয় নাই। যে সময়েই পাট্টা দেওয়া হইয়া থাকুক না কেন, সকল পাট্টার ম্যাদই ১২৯০ সনে শেষ হইবে; অর্থাৎ বর্ত্তমান বন্দোবস্ত ১২৯০ সন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৫শে জুন তারিখে এই সময় নির্দ্ধারণের অনুজ্ঞা প্রচারিত হয়। পরে রাজা ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। বন্দোবস্তের ভারপ্রাপ্ত বেকেট সাহেব ১৮৭৪ সনে ভূমির স্বত্ব সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

রাজা সমুদয় ভূমির অধিকারী। বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের জমীদারগণের সহিত প্রজার যেরূপ সম্বন্ধ, এখানে রাজার সহিতও জোতদারের প্রায় তদনুরূপ সম্বন্ধ। এতদ্ব্যতিরিক্ত নানা প্রকারের স্বত্ববান্ অধিকারী

আছে।—যথা ১। জোতদার ২। চুকানীদার। ৩। দর-চুকানীদার। ৪। দরাদরচুকানীদার। ৫। তস্যচুকানীদার। ৬। আধিয়ার।

১। জোতদারঃ রাজার অব্যবহিত নীচেই জোতদার অথবা জোতের স্বত্বাধিকারী। জোতস্বত্ব পুরুষানুক্রমিক, হস্তান্তর যোগ্য, এবং দেশীয় আচার ব্যবহারানুযায়ী বিভাগ যোগ্য। জোতদার প্রচলিত কর প্রদানে সম্মত থাকিলে, রাজা তাহার স্বত্ব স্বীকার করেন। জোতদারগণ যে খাজানা দেয় তাহা বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান বন্দোবস্ত বার বৎসরের জন্য হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

২। জোতদারের অব্যবহিত নিম্নেই চুকানীদার। জোতের কতক অংশ ভোগকরে। তাহাদের দখলি স্থানের নাম চুকানী। জোতদারের অনুমতি লইয়া চুকানী স্বত্ব বিক্রয় করা যাইতে পারে। জোতদার নিজে খরিদ না করিলে চুকানী স্বত্বের ধ্বংস হয় না। দেওয়ানী ও খাজানার ডিক্রিতে এই চুকানী, জোতদারের অনুমতি ব্যতীতই বিক্রয় হইতে পারে। চুকানীদারের দখলি স্বত্ব আছে। তাহার স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক এবং বিভাগযোগ্য। জোতদার রাজাকে যত খাজানা দেয় চুকানীদার তাহা হইতে শতকরা ঊর্দ্ধসংখ্যা ২৫৲ টাকা পরিমাণে অধিক খাজানা জোতদারকে দিয়া থাকে। প্রত্যেক চুকানীদারের জমীর পরিমাণ এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যা তাহার জোতদারকে কত খাজানা দিতে হইবে, তাহা রাজকীয় তেরিজে উল্লেখিত আছে এবং তাহার নকল

চুকানীদারকে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং জোতদার কোন প্রকার অধিক দাবী করিতে পারেনা।

৩। চুকানীদারের নীচে দরচুকানীদার। তাহাদের স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য কিন্তু জোতদারের অনুমতি সাপেক্ষ। তাহাদেরও দখলি স্বত্ব আছে। দরচুকানীদার জোতদারের রাজস্বের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা হারে অধিক চুকানীদারকে দিয়া থাকে।

৪। দরচুকানীদারের নীচে দরাদর চুকানীদার। দরচুকানীদারের সকল স্বত্বই ইহাদের আছে। জোতদারের রাজস্ব হইতে ইহারা শতকরা ৭৫৲ টাকা অধিক দেয়।

৫। ইহার নীচে তস্যচুকানীদার। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

৬। আধিয়ার অর্থাৎ প্রজা ইহারা জোতদারের ভূমিকর্ষণ করিয়া অৰ্দ্ধেক উপস্বত্ব তাহাকে প্রদান করে এবং অপরার্দ্ধ নিজেরা ভোগ করে। পূর্ব্বে ইহাদের কোন স্বত্ব ছিলনা। ১৮৭২ সনের ৪ঠা অক্টোবর বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সারজর্জ কেম্বেল সাহেব আদেশ প্রচার করেন যে, একাদিক্রমে কোন প্রজা ১২ বৎসর কোন জমী আবাদ করিলে তাহার দখলি স্বত্ব জন্মিবে। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেই কিয়ৎ পরিমাণ জমী আবাদ করিয়া থাকে; কাজেই সকল শ্রেণীরই আধিয়ার আছে।

বঙ্গদেশে জমীদারের নিম্নে কেবল এক শ্রেণীর প্রজার দখলী স্বত্ব আছে; কিন্তু এখানে সকল শ্রেণীর প্রজারই কোন না কোন স্বত্ব আছে। এবং তাহাকে ঊর্দ্ধসংখ্যা কত জমা দিতে হইবে তাহাও তাহার জানা আছে। সুতরাং

কোন প্রকার অনিয়মিত কর তাহার দিতে হয় না। নিম্ন-শ্রেণীর প্রজাগণ বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের সেই শ্রেণীর প্রজাগণ হইতে ভাল অবস্থায় আছে। বন্দোবস্ত জোতদারের সঙ্গেই হইয়াছে। জোতদারগণই কবুলিয়ত প্রদানে পাট্টা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে চুকানীদার হইতে কত খাজানা পাইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে।

আরও কয়েক প্রকারের ভূমির অধিকারী আছে তাহাদের সম্যক বিবরণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

১। ব্রহ্মোত্তর ঃ—রাজা প্রতিপালন উদ্দেশে যে ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন তাহাকে ব্রহ্মোত্তর বলে। ইহার স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক এবং হস্তান্তর যোগ্য।

২। মোকররী ঃ—নির্দ্দিষ্ট খাজানাতে যে জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার অধিকারিগণের কোনও আবোয়াব দিতে হয় না কেবল বাট্টা দিতে হয়। এই মোকররী দুই প্রকার ঃ—কোন পাট্টাতে রাজা উত্তরাধিকারি স্বত্ব প্রদান করিয়াছেন, কোন পাট্টাতে করেন নাই। উত্তরাধিকারী না থাকিলে মোকররী, রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়।

৩। পেটভাতা ঃ—রাজা তাঁহার জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণের ভরণপোষণ জন্য তাঁহাদের জীবিতকাল পর্য্যন্ত কতক জমী দান করিয়া থাকেন। প্রথম প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য রাজার নিকট আবেদন করিতে হয়। পুনঃ প্রদান গ্রাহ্য না হইলে উত্তরাধিকারিগণকে সাধারণতঃ জোত স্বরূপে ঐ জমী দেওয়া হয়। অন্যান্য জোতদারগণের ন্যায় তাহাদেরও

প্রচলিত খাজানা দিতে হয়। পেটভাতা জমীর স্বত্ব হস্তান্তর করা যায় না।

৪। বক্সিস্ঃ—ইহা এক প্রকার নাখেরাজ জমী। কোনও শ্রেণী বিশেষের লোককে প্রদত্ত হয় না, ইহা কেবল ভালকাজের পুরষ্কার। ইহার স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক এবং হস্তান্তর যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকিলে সরকারে জব্দ হইয়া যায়।

৫। দেবত্র ঃ—কোনও দেবদেবীর পূজার ব্যয়াদি নির্ব্বাহ জন্য যে ভূমি দেওয়া যায়; ইহার স্বত্ব কোন প্রকার বিক্রী বা হস্তান্তরিত হইতে পারে না। এস্থানে দুই প্রকারে দেবত্র দেখা যায়। (১) রাজকীয় দেবত্র ঃ— এই সকল দেবদেবীর পূজা কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সরকারী কার্য্যকারক নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলে। ধর্ম্মাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে এই সকল পূজা কার্য্য সম্পাদিত হয়। এক এক স্থানের পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি আছে, দেবত্র ভূমির রাজস্ব হইতে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। (২) রাজার স্বকীয় দেবদেবীর পূজার জন্য যে সকল ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। পূজার জন্য কতকগুলি সেবাইত অর্থাৎ পূজক আছেন। তাঁহাদিগের উপর ধর্ম্মাধ্যক্ষের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। রাজকীয় দেবত্র প্রাপ্ত সেবাইতের মৃত্যু হইলে অন্য সেবাইত নিযুক্ত করা হয়। তাহার উত্তরাধিকারী উপযুক্ত হইলে প্রায়শঃ তাহাকেই দেওয়া হয়।

৬। পীরোত্তর ঃ—মুসলমানদিগকে তাহাদের দেব সেবার জন্য যে ভূমি দেওয়া যায়।

৭। জায়গীর ঃ—নিয়মিত সময়ে প্রয়োজনানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজসরকারে কতকগুলি লোক নিযুক্ত থাকে। তাহাদিগকে নগদ বেতন না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কতক ভুমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে দেওয়া হয়। সেই ভুমিকে জায়গীর বলে। যদি তাহারা কাজ না করে কিংবা কাজের অনুপযুক্ত হয়, কিংবা কাজের আবশ্যকতা না থাকে তবে আর জায়গীর থাকে না। জায়গীরের জমীর স্বত্ব দান বিক্রীর অধিকার নাই। সাধারণতঃ উপযুক্ত উত্তরাধিকারিগণই জায়গীরের অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিতে রাজা বাধ্য নহেন। নীচ শ্রেণীর প্রায় সমুদয় কর্ম্মচারীই জায়গীর পাইয়া থাকে। যথা ঃ—তামাকবরদার, ঝাড়িধরা, বোকনাধরা ইত্যাদি। যে, যে কাজ করে তদনুসারে উপাধি হইয়া থাকে।

খাজানার হার।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেব যে খাজানা স্থিরতর করিয়াছিলেন তাহার এক তালিকা এখানে দেওয়া গেল। নিম্নলিখিত খাজানার উপর আবোয়াব ও অন্যান্য প্রকারের কর দিতে হইত। সেই বন্দোবস্তে প্রত্যেক বিশের খাজানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এক এক বিশ, বার বিঘা ষোল কাঠার সমান।

কি প্রকারের জমি	এক বিশের জমা	এক বিঘার জমা	আবোয়াব ও অন্যান্য কর সমেত প্রত্যেক বিঘাতে কত দিতে হইত
আউয়াল	... ৬৶৯	‖৬	৶২
দৈয়ম ...	... ৫/৭	।৵৪	‖/২
ছৈয়ম ...	... ৪।०	।/১	।৶৭
চাহরম	... ৩।৵৪	।৩	।৵১
বাঁশ ভূমি	... ১০৶২	৶৯	১৵৩
ছন ...	... ৬৶৯	‖৬	৶২
লায়েক পতিত	... ২‖৯	৶২	।৬
নিজবাস্তু	... ২৭৵২	২৵	৩৲
বাজে বাগান	... ২৭৵২	২৵	৩৲
সুপারি বাগান	... ৫৪।৵৪	৪।०	৬/৫
প্রজাবাস্তু	... ২০।৵৪	১‖/৬	২।৬

এই বন্দোবস্তের পর রহিমগঞ্জ পরগণাতে আর এক বন্দোবস্ত হইয়াছিল; তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ খাজানা ধার্য্য হয়।

কোন্ প্রকারের জমি	প্রতি বিঘার খাজানা
আউয়াল	... ৶৩
দৈয়ম	... ‖৵०
ছৈয়ম	... ‖०
চাহরম	... ।৵०
লায়েক পতিত	... ।०
বাস্তু	... ৩৲
উদ্বাস্তু	... ২৲
বাজে বাগান	... ৩৲
সুপারি বাগান ...	... ৬৲

উপরোক্ত হারের খাজানা সম্পূর্ণ আদায় হইত না। জোতদারদিগকে শতকরা ৪০ টাকা মাপ দিতে হইত। জোতদারের নিম্নবর্ত্তী অধিকারিগণের সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিলনা। জমির অবস্থা বিবেচনায় চুকানীদারদিগকে প্রত্যেক বিশে ৩ টাকা হইতে ২০ কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত জোতদারের রাজস্ব অপেক্ষা অধিক দিতে হইত। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ১৮৭২ খৃীঃ ৪ঠা অক্টোবর বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বর্ত্তমান প্রচলিত বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিয়াছেন। এই বন্দোবস্ত বাং ১২৯০ সন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। নিম্নলিখিত হারে জোতদারের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে।

বাস্তু, উদ্বাস্তু, বাজে বাগান, সুপারি বাগান প্রত্যেক বিঘা ২॥০, বাঁশ বাগান প্রত্যেক বিঘা ১॥০, আবাদি জমি প্রত্যেক বিঘা ॥০ আনা।

বিল ও জলা কোনও জোতে দুই বিঘা কি তাহার ন্যূন থাকিলে প্রত্যেক বিঘা ॥০ আনা।

জঙ্গল ও অনাবাদি প্রত্যেক বিঘা /০ আনা।

রাজধানীতে বাজারের দিকে রাস্থার সম্মুখস্থ ভূমির এক হস্ত প্রস্থ এবং ২০ হস্ত দীর্ঘ পরিমাণ জমির খাজানা বার আনা এবং অন্যান্য জমির খাজানা প্রতি বিঘা আট ও ছয় টাকা।

মফঃসলের হাট সমুহে রাস্তার সম্মুখস্থ ভুমির একহস্ত প্রস্থ এবং ২০ হস্ত দীর্ঘ পরিমাণ জমির খাজানা চারি আনা এবং হাটের অন্যান্য জমির খাজানা প্রতি বিঘায় চারি টাকা।

এই বন্দোবস্ত জোতদারের নীচ শ্রেণীর অধিকারিগণের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা জনক। জোতদারগণ কোন প্রকার আবোয়াব গ্রহণ করিতে পারেন না। নির্দ্দিষ্ট কর পাইয়াই তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

অধিবাসী ও ভাষা।

কোচবিহারের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী ও মুসলমান। রাজবংশীর সংখ্যা মুসলমান হইতে প্রায় তিনগুণ অধিক হইবে। এতদ্ব্যতীত কোচ, মেচ, গারো, দোভাষীয়া, মোড়ঙ্গিয়া প্রভৃতি এবং আর্য্য বংশ সম্ভূত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও কায়স্থের বসতি আছে। ১৮৮১ সালে যে লোক সংখ্যা নির্ণয় করা হয় তাহাতে লোকের সমষ্টি ৬০০৯৪৬ স্থির হইয়াছে।

থানার নাম	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
হলদিবাড়ী ...	... ১৮২৮২	১৬৯৭০	৩৫২৫২
মেকলীগঞ্জ ...	... ২৭২৮১	২৪৮১৪	৫২০৯৫
মাথাভাঙ্গা ...	... ৭৯২৩০	৭৪০১২	১৫৩২৪২
দীনহাটা ...	... ৭৮৮৯৫	৭৬৫২৭	১৫৫৪২২
কোচবিহার...	... ৭৩০১৫	৬৬১৬০	১৩৯১৭৫
তুফানগঞ্জ ...	... ৩৪০৮৬	৩১৬৭৪	৬৫৭৬০
	৩১০৭৮৯	২৯০১৫৭	৬০০৯৪৬

হিন্দু	৪২৫৪৭৮
মুসলমান	১৭৪৫৩৯
খৃষ্টিয়ান	৪৮
জৈন	১৪৪
সাঁওতাল	১৯
আদিম জাতীয়	৩৯৬
অন্যান্য	৩৬২

কোচবিহারবাসিগণ বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহে। অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত মুলক, মধ্যে মধ্যে পারসী মুলক শব্দও ব্যবহার করিয়া থাকে। মেচ ও কাছারি ভাষার শব্দও অনেক প্রচলিত আছে।

ছাপাখানা।

মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণই তাঁহার রাজত্ব সময়ে একটী প্রেস্ আনেন, কিন্তু তাহা অনেকদিন পর্য্যন্ত কমিসনরের তত্ত্বাবধানে জলপাইগুড়ীতে থাকে। ১৮৭৫ খৃঃ উহা রাজধানীতে আনা হয় এবং বর্ত্তমান ট্রেজারী একাউণ্টেণ্ট বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ ইহার তত্ত্বাবধারণের কার্য্যে নিযুক্ত হন। সম্প্রতি একজন প্রিণ্টার, তিনজন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ কম্পজিটর, এবং দুই জন সহকারী কম্পজিটার, এক জন বাঙ্গালা কম্পজিটার, ১ জন প্রেসম্যান, এবং তাহার দুইজন সহকারী দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। জেলখানার ১২ জন কয়েদী নিয়মিতরূপে কম্পজিটার এবং অন্যান্যের সহায়তা করে। বৎসর ৪৬১১ টাকা বেতনাদিতে ব্যয় হয়। দ্রব্যাদির মুল্যে বৎসর ৬০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। রাজকীয় এবং চাকলাজাতের যে সকল ফারম ইত্যাদি ছাপাইতে হয় তাহা এখানেই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কমিসনরের আদেশমতে, রাজসাহী বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারদিগের ফরমাইস মত কাজও করিতে হয়।

প্রত্যেক বৎসর প্রেস হইতে যে সকল কাজ হয়, তাহার আনুমানিক মূল্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

রাজকীয় আফিসের জন্য	...	...	১৫০০০
চাকলাজাত	...	...	৬০০০
অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের কাজ	...	...	১৫০০
			২২৫০০

এই সকল কাজের জন্য কাহারই মূল্য দিতে হয় না।

পত্রাদি প্রচলন।

ডাকের পত্র প্রচলনের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী পোষ্ট আফিস আছে। তন্মধ্যে কোচবিহার পোষ্ট আফিস প্রধান। এতদ্ব্যতীত হলদিবাড়ী, মেকলীগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, দীনহাটা এবং বলরামপুরে কয়েকটীশাখা পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে রেলওয়ের কার্য্য সম্যক বিস্তৃত হওয়াতে, পত্রাদি প্রচলন কার্য্যেরও অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতার পত্র যে দিন তথা হইতে রওনা হয়, তাহার পর দিবস একটার সময়েই এখানে পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিস ব্যতীত রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য সরকারী ডাক আছে, ইহাকে থানার ডাক বলে। প্রত্যেক থানাতে এবং প্রত্যেক থানা হইতে প্রত্যেক দিবস কোচবিহারে পত্রাদি আসিতে এবং যাইতে পারে। সরকারী কোনও পত্রের মাশুল দিতে হয়না। এই কার্য্যের ভার পুলিশ বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের হস্তে ন্যস্ত আছে। এই

ডাকদ্বারা যে কেবল থানাতেই পত্র প্রেরণ করা যায় এমত নহে; থানার অধীনস্থ পল্লীগ্রাম সমূহেও পত্রাদি চলিতে পারে। পল্লীগ্রামে পত্র বিতরণ জন্য স্বতন্ত্র পিয়ন নাই, গ্রাম্য চৌকিদারেরাই এই কার্য্য করিয়াথাকে*।

রাজধানী।

কোচবিহার নগরই এই রাজ্যের রাজধানী। ইহা উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১॥ দেড় মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে কিঞ্চিদূন এক মাইল প্রশস্ত। প্রায় তিন দিকই তোর্ষা-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত, উত্তরদিক হইতে আর একটী নদী আসিয়া তোর্ষার সহিত মিলিত হইয়াছে। অনেকে অনু-মান করেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ সুখে বিহার উদ্দেশে এই স্থানে বৎসরের কয়েক মাস অতিবাহিত করিতেন এবং কালক্রমে এই স্থানই রাজধানীতে পরিণত হই-য়াছে; এই জন্যই ইহার নাম বিহার। কিন্তু আমাদের বিবে-চনায় এইটী সুখে বিহারের স্থান নহে, স্থানটীর প্রাকৃতিক গঠন দৃষ্টি করিলে ইহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইবে যে, কেবল ভোটান রাজের অত্যাচার হইতে বিমুক্তি পাওয়ার জন্যই এস্থানে রাজধানী করা হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে নদী পরিবেষ্টিত থাকাতে, বিপক্ষের আক্রমণ হইতে সহজেই নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা ছিল। বিশেষতঃ ভোটান

* ১৮৮৩ সনের জুলাই মাস হইতে থানার ডাক উঠিয়া গিয়াছে। রাজকীয় পত্র গবর্ণমেণ্টের ডাকে প্রেরিত হয়। রাজকীয় কর্ম্মকারক-গণ সার্ব্বিসষ্টাম্প ব্যবহার করিয়া থাকেন।

রাজ্যের সীমা হইতে পূর্ব্ব রাজধানী যতদূরে ছিল ; ইহা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত।

নগরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে রাজবাটী, বর্ত্তমান রাজবাটী তাদৃশ সুসজ্জিত নহে। দুই তিনখানা মাত্র সাধারণ অট্টালিকা আছে, তদ্ব্যতীত সমস্তই খড়ের ঘর। রাজবাটী ইষ্টক প্রাচীরে পরিবেষ্টিত বটে, কিন্তু প্রাচীর তেমন সুদৃঢ় নহে এবং সকল স্থানে অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান নাই। একজন বিদেশীয় লোক প্রথম ইহা দর্শন করিলে, কখনও ইহা রাজবাটী বলিয়া স্থির করিতে পারেনা। নুতন রাজবাটী নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যেরূপ আয়োজন দেখা যায়, তাহাতে ভাবিফল ভাল হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা।

রাজবাটীর উত্তর পূর্ব্বদিকে রাজার জ্ঞাতি কুটুম্ব ইত্যাদি কতকগুলি লোকের বাটী। এই স্থানকে পুরাণাবাস বলে। রাজবাটী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নীলকুঠী পর্য্যন্ত ইষ্টকময় রাস্তা। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে রাজবাটীর প্রান্ত হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদিগের নানাপ্রকারের দোকান। অনেক ব্যবসায়ীই এখন ইষ্টক ও টীন নির্ম্মিত গৃহ প্রস্তুত করিয়াছে। এই রাস্তার দক্ষিণদিকে বাজার। ইতিপূর্ব্বে ক্ষুদ্র খেড়োঘর থাকাতে ব্যবসায়ীদের বিশেষ কষ্ট হইত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, রাজকীয় ব্যয়ে টীনের ঘর প্রস্তুত হওয়াতে, সে কষ্ট দূর হইয়াছে। বাজার প্রত্যহ সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া, রাত্রি ৮।৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত থাকে। কতকগুলি স্থায়ী দোকানদারও আছে। প্রাতে বাজার নাথাকাতে অনেক

লোকের অসুবিধা হয়, এজন্য নগরের দক্ষিণভাগে একটী বাজার সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার কার্য্য প্রাতঃকালে হয় বটে, কিন্তু এদেশীয় লোকদিগের অনেকেই সকাল বেলা হাট, বাজার করিতে ভাল বাসেনা, কেবল বিদেশীয় ভদ্রলোকদের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করিয়া কথঞ্চিৎ চলিতেছে; এজন্য বাজারের অবস্থাও উন্নত হয় নাই। পুরাতন বাজারের দক্ষিণদিকে লালদীঘী। এই দীঘীর পূর্ব্বপারে শিল্পবিদ্যালয়, দক্ষিণপারে থানা ও ডাক্তরখানা, পশ্চিমপারে কতকগুলি দোকান। শিল্পবিদ্যালয়ের পূর্ব্বদিকে বেশ্যালয় সকল সংস্থাপিত। অন্যান্য নগরের ন্যায় বেশ্যা সকল যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানে বাস করিতে পারে না। তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া নগরের পূর্ব্বাংশে বাস করিতে হইবে। বেশ্যাপাড়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে জেলখানা, উহা সুন্দর সুদৃঢ় ইষ্টকপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং নগরের সীমাস্থলে অবস্থিত। জেলখানার পশ্চিমদিকেই সৈন্যাবাস ও পুলিস লাইন। এই লাইনের পশ্চিম-দক্ষিণদিকে, বৈরাগীর দীঘী নামক একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করা হইয়াছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে কেবল ভদ্রলোকের আবাসস্থান। এবং কতকদূর দক্ষিণে নুতনবাজার, নগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত।

রাজবাটী হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে সাগরদীঘী নামক এক প্রশস্ত দীর্ঘিকা। ইহার চতুঃপার্শ্বে বৃহৎ২ অট্টালিকা সকল সংস্থাপিত। উত্তরপার্শ্বে ডিপুটী কমিসনর ও দেওয়ানের কাছারী এবং ট্রেজারী, পশ্চিমদিকে বোর্ডিংস্কুল, দক্ষিণদিকে লাইব্রেরী এবং আদালত ও ফৌজদারীর

কাছারী, পূর্ব্ব পারে ছাপাখানা, জেঙ্কিন্স স্কুল এবং নর্ম্মাল স্কুল। এই সকল অট্টালিকা বিলক্ষণ সুদৃশ্য। বাস্তবিক এস্থানটী এমত মনোরম যে, অন্যান্য সাধারণ জেলাতে এরূপ মনোরম স্থান প্রায় দেখা যায় না। সাগর দীঘীর পশ্চিমে তোর্ষানদী পর্য্যন্ত নগরটী বিস্তৃত বটে, কিন্তু তোর্ষার ধারে কেবল এদেশীয় লোকের আবাস-স্থান। নদী ও সাগর দীঘীর মধ্যে দেবীবাড়ী। এস্থানে শারদীয় পূজা হইয়া থাকে। পূজার সময় প্রত্যেক বৎসর কতকগুলি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। সাগর দীঘীর দক্ষিণ পারেও সহরটী তোর্ষানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নদীতে বার মাস কথঞ্চিৎ পরিমাণে জল থাকে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কোনও কালে নগরের নিকট নৌকাদি আসিতে পারে না। নগরের বাণিজ্য কার্য্য স্থলপথেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। নগরের গঠন সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বায়ু গমনাগমনের কার্য্যে কোনও অসুবিধা দেখা যায় না। সমস্ত সড়কগুলি নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সরল ভাবে বিস্তৃত এবং সড়কের সংখ্যাও অল্প নহে। বর্ষাকালে বদ্ধজল নির্গমনের বিলক্ষণ উপায় আছে। প্রত্যেক সড়কের পার্শ্বে নালা আছে ঐ গুলি নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সুতরাং বদ্ধজল অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারে। পল্লিগ্রাম অপেক্ষা নগরটী বিশেষ স্বাস্থ্যকর।

সহরের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে ইংরেজদিগের আবাস স্থান। উহা নীলকুঠী নামে প্রসিদ্ধ। নীলকুঠী একটী প্রশস্ত মাঠ, ইহার মধ্যভাগে ইংরেজ

কর্ম্মচারীদিগের বাসোপযোগী উদ্যান শোভিত, সুদৃশ্য, কয়েকখানি বাসস্থান। পশ্চিম প্রান্তে টেলিগ্রাম আফিস ও অশ্বশালা, দক্ষিণদিকে পীলখানা। পূর্ব্বে এস্থানে নীলের কুঠী ছিল। এই নীলকুঠী হইতে রাজপথ সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। স্থানটী বিলক্ষণ সুদৃশ্য ও মনোরম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হয় না। নীলকুঠীর উত্তর-পূর্ব্বদিকে একটী ছোট নদী আছে। এই নদীই এক প্রকার নগরের সীমা বলিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান শাসন প্রণালী।

কোচবিহার একটী করদরাজ্য। এদেশীয় আইনানুসারে শাসন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর অপূর্ণবয়স্ক বিধায় ১৮৬৪ সন হইতে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের হস্তে এরাজ্যের শাসনভার সমর্পিত আছে। ভোটান যুদ্ধের অবসানে ১৮৬৬ খ্রীঃ কোচবিহার, দারজিলিং, জলপাইগুড়ী, গোয়ালপাড়া, গারোপাহাড় এই কয়েকটী স্থানকে এক কমিসনরীভুক্ত করা হয়। এবং আইন বর্জ্জিত প্রদেশরূপে গণ্য করা হয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ আসাম বঙ্গদেশ হইতে পৃথকরূপে গণ্য হইলে, কোচবিহার, রাজসাহী ও কোচবিহার কমিসনরী বিভাগের এক অংশ হইয়া পড়ে। মহারাজের প্রতিনিধি স্বরূপ রাজসাহী ও কোচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেব এরাজ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া

থাকেন*। তন্নিম্নে একজন ডিপুটী কমিসনর আছেন, তিনি নিজে কোচবিহারে অবস্থিতি করেন। সাধারণ ব্যবস্থা সমন্বিত প্রদেশ সমূহের জজ ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ইহাঁর আছে। ইঁহার বিচার্য্য মোকদ্দমার আপীল কমিসনর সাহেবই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। তন্নিম্নে যে সকল কার্য্যকারক এবং বিভাগ আছে তাহার সম্যক্ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

ডিপুটী কমিসনরের আফিস।

এই আফিস দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ইংরেজী বিভাগ, এই বিভাগে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি বিষয়ক যাবতীয় কার্য্য হইয়া থাকে। সেসন ও দেওয়ানী উভয় বিধ মোকদ্দমা ডিপুটী কমিসনর বিচার করিয়া থাকেন। নিম্ন আদালতের আপীল ও তাঁহার শুনিতে হয়। কার্য্যকারক নিযুক্তি বিষয়ক কার্য্যও এই বিভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিভাগকে অডিট্ আফিস বলে। ইহাতে মঞ্জুরী প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, কিয়ৎপরিমাণ টাকা ডিপুটী কমিসনর মঞ্জুর করিতে পারেন, অধিক হইলে কমিসনর করিয়া থাকেন, এবং গুরুতর হইলে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর করেন। এই বিভাগে নিকাশের কার্য্যও হইয়া থাকে। রাজ্যের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় হিসাব এই বিভাগে তদন্ত হইয়া থাকে। বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের একাউণ্টেণ্ট জেনেরলের আফিস ও এই আফিসে মৌলিক কিছু প্রভেদ নাই। কেবল একটী অতি বৃহৎ এইমাত্র।

* ভূমিদান, পেনসন্ প্রদান এবং প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা বলবৎ করণ ব্যতীত মহারাজের অন্যান্য সমুদয় ক্ষমতা কমিসনরের আছে।

বিগত পাঁচ বৎসরে রাজ্যে যত প্রকারের আয় এবং ব্যয় হইয়াছে তাহারএকটী তালিকা দেওয়া যাইতেছে :—

	আয়।				
	১৮৭৭-৭৮	১৮৭৮-৭৯	১৮৭৯-৮০	১৮৮০-৮১	১৮৮১-৮২
১। ভূমির রাজস্ব	৮২৬৪০৩	৮৫০৮৮৫	৯৪৪৩৭৯	৮৬০৩৪২	৮৭৮৪৭৩
২। ষ্টাম্প	৯৩০১০	১৪৪৪৭২	২১১২৪৩	১১৭৫০৭	১২৭৫৩৯
৩। সুদ	৮৪২৭০	১০২০৬৬	৭৭৪২৩	৭৭৪০৪	৯৫৬৯১
৪। দেবত্র	৮০৪৯৫	৪৫২৯০	৯০৮৬৭	৮৪১৮৩	৮৪৬১৭
৫। অন্যান্য	৬১৬৯৭	৬৬৩৪৮	৩৬৪৪২	৬৪১৭৩	৩৬২০১
৬। আবকারী	৪৮৮২০	৫২৬৫০	৫৭৭৫১	৫৯২২৬	৬২৬৩৫
৭। দেওয়ানী ও ফৌজদারী	৫১৩৮	৮৭৫৪	৭৬৪৫	৮৯১৩	৯১৪৫
৮। জেলখানা	৬৫৯১	৯২৯২	৮৮২২	৭৩৩৮	৭৫৫০
৯। রেজেষ্টরী	৩৬৬৪	৪২৬৪	৫৬৯৬	৪০৪৪	৬৩৩৪
১০। শিক্ষাবিভাগ	২৯৮৯	১৭২২	১৬৯৩	১৯৩০	২৩৯১
১১। পূর্ত্তবিভাগ	১৩৫০৬	২৯১৭৯	৩০০০৬	১০৩০৬	৯৮১০
	১২২৬৫৭২	১৩৫৪৭২১	১৪৭২০০৭	১২৯৫৩৬৬	১৩২০৩৯৫

	ব্যয় ।				
	১৮৭৭-৭৮	১৮৭৮-৭৯	১৮৭৯-৮০	১৮৮০-৮১	১৮৮১-৮২
১। রাজা ও তদীয় পরিবার পোষণাদি	১৮৯২০৫	২৯৫৮৩৭	২৪৮০১৮	২৮২৫৭৫	৩০৯৪৯৪
২। রাজস্ব	১১১৯০৯	১১৩৫৫৫	১১২৪৫০	১১৫৯০১	১১৫৫৭৭
৩। শিক্ষাবিভাগ	৬১৫৭৫	৫৯৭৭২	৬৩৬৬৬	৬১৮১৩	৬২২৩৭
৪। ফৌজদারী ও দেওয়ানী... ...	৪৬০৬২	৪৯২৭৬	৪৮৩৩৫	৫৪১২৯	৫৩৪৫৫
৫। শাসন	৪৭৪৪১	৫২১৫২	৫২৬৬৪	৫৩৩২২	৪৬৬৫৭
৬। জেল	২৭৬৪৯	২০৫৬৮	১৭৭০২	১৯৮৯২	১৬৭৩৬
৭। পুলিশ	৪৩২০৯	৪৭৬৭৫	৬৭৪০৪	৪৮২৭০	৪৮০৮০
৮। সৈন্য	২২৩৭৫	১৩৮১১	১৪৬৪৩	১৭৪৯৫	১৫২১৩
৯। অন্যান্য	৭০৪৩৪	১৪০৫৬৭	৯৫০৬২	৮৪১৭৩	৮৭১৯২
১০। পেন্সন ও অন্য দাতব্য	৩০৪০৬	২৯৬৬৮	২৬৬৫৯	২৫৮৬৩	২৬৬২৪
১১। দেবত্র	৪২০২৫	৩৬৭৮৯	৩৫৬২৬	৩৪৬৪২	৩৫৮৫৯
১২। চিকিৎসা বিভাগ	২০৪৮৬	২১৬৩১	২২৫৫৫	২৩৭০১	২৪৩২০
১৩। রেজেষ্টরী	২৪৪১	২৬৯৯	৩০১০	২৫৩১	৩০৬৫
১৪। আবকারী	৭৮৪২	৮৪৪৭	৭৮২৩	৭৬৮৭	৬৮৬৮
১৫। ছাপাখানা ও ষ্টাম্প	১২৩১১	১৫৯২১	১৮২৪০	১৬৬৩২	১৩৭৮৭
১৬। পূর্ত্তবিভাগ	৪৫৬১০০	২৬০১০০	৩০১৫০০	৩৩৬৮৯৯	২৯৭০৭০
রাজার বিবাহ	১৫৫০৫৪	৪৮৪৪	......	......	......
	১৩৪৬৪২৪	১১৭৩২১২	১১১৭৭৫৭	১১৮৫৫২৫	১১৬৩৪৩৪

খাজানা বিভাগ।

এই বিভাগের তত্ত্বাবধারণের ভার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। প্রত্যেক মহকুমাতে একজন নাএব আহেলকার আছেন। রাজধানীতে দেওয়ানের একজন সহকারী আছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় অবস্থা তদন্তের জন্য ৬ জন কানুনগো আছেন। বঙ্গদেশীয় খাজানা সম্বন্ধীয় ১৮৫৯ সনের ১০ আইন অংশতঃ এ প্রদেশে প্রচলিত আছে। গড়ে বৎসর ২১৯৭ মোকদ্দমা রুজু হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যবস্থা সমন্বিত প্রদেশ সমূহে ১০ আইন সম্বন্ধীয় যে সকল মোকদ্দমার আপীল কালেক্টর নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, এখানে সেই সকল আপীলের বিচার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। অপর যে সকল আপীল জজ সাহেবের নিকট হয়, তাহা এখানে ডিপুটী কমিসনরের নিকট হইয়া থাকে। অন্যান্য আপীল দেওয়ানের নিকট হইয়া থাকে। মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকগণের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল উল্লিখিত মতে দেওয়ান ও ডিপুটী কমিসনরের নিকট হইয়া থাকে। খাজানা বিভাগকে সাধারণতঃ মালকাছারী বলে। ইহার কর্ত্তৃত্বাধীনে কতকগুলি জোত আছে। এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে গড়ে বার্ষিক ৪৫৭৫৪ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

আবকারী।

মালকাছারীর তত্ত্বাবধারণ ব্যতীতও কতকগুলি কার্য্যের ভার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। তন্মধ্যে

আবকারী তত্ত্বাবধারণ। এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একজন দারোগা আছেন। দেশীয় মদ্য, গাঁজা ও আফিঙ্ প্রভৃতিতে এবং মাদক ব্যবসায়ীদিগের শুল্কাদিতে বার্ষিক প্রায় ৬০০০০ টাকা আয় হইয়া থাকে। এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ গড়ে বার্ষিক ৩২২৭ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ট্রেজারীর ভারও দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত আছে। ট্রেজারীটী গবর্ণমেণ্টের একটী শাখা ট্রেজারী। রাজকোষের এবং গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সকল কারবার হয় তাহা এখানে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ষ্টাম্প হইতেও রাজ্যের যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। কাগজগুলি ইংলণ্ড হইতে আনা হয় এবং এখানে মোহর দেওয়া হয়।

দেওয়ানী বিভাগ।

এই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী আহেলকার বলে। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজের যে সকল ক্ষমতা আছে দেওয়ানী আহেলকারের প্রায় তৎসমুদয় ক্ষমতাই আছে। প্রত্যেক মহকুমাতে যে সকল কার্য্যকারক আছেন তাঁহাদের এবং সদরস্থিত যে সকল সহকারী আহেলকার আছেন তাঁহাদের নিষ্পত্তিয় মোকদ্দমার আপীল দেওয়ানী আহেলকারকে নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং অধিক দাবীর মোকদ্দমা হইলে তাঁহার নিকটই রুজু হইয়া থাকে। দেওয়ানী আহেলকারের নিষ্পত্তিয় মোকদ্দমার আপীল ডিপুটী

কমিসনরের নিকট হয়। সর্ব্বশুদ্ধ এই বিভাগে বৎসর ২৭৯৮ মোকদ্দমা রুজু হইয়া থাকে। এই বিভাগের জন্য গড়ে বার্ষিক ১৭৬০৩ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। দেওয়ানী আহেলকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে রেজিষ্টরী আফিস। সদরে একজন সব রেজিষ্ট্রার আছেন এবং মহকুমার কার্য্যকারকগণেরও রেজিষ্টরী করার ক্ষমতা আছে। গড়ে প্রতিবৎসর রেজিষ্টরী কার্য্যে ৫০০০ টাকা আয় ও ১৫০০ টাকা ব্যয় হয়।

ফৌজদারী বিভাগ।

এই বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ককে ফৌজদারী আহেলকার বলে। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অধিকাংশ ইহাঁর আছে। মহকুমাতে যে সকল কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদের হস্তে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহাদের নিষ্পত্তির মোকদ্দমার আপীল ডিপুটী কমিসনর গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার সর্ফর্দ্দনতে ফৌজদারী আহেলকারের নিকটও আপীলের বিচার হইয়া থাকে। সেসনের মোকদ্দমা ডিপুটী কমিসনরই বিচার করেন। গড়ে বৎসর সমুদয় প্রকারের ২১০৫টী মোকদ্দমা হইয়া থাকে এবং ২০৪৮ ব্যক্তির বিচার হয়, তন্মধ্যে ১১০৯ লোকের দোষ প্রমাণিত হইয়া শাস্তি পায়। বৎসর অপমৃত্যুর সংখ্যা গড়ে ১৩৭, তন্মধ্যে আত্মহত্যা ৫, জলডুবা ৬৬, সর্পাঘাত ৩৪, বন্যজন্তুর গ্রাস ৩, অন্যান্য কারণে ২৯।

রাজ্য মধ্যে ৩৭টী খোঁয়াড় আছে। তাহা হইতে বার্ষিক ৫০০০ টাকা আয় হয়, কার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

নগরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কার্য্যভার এবং শান্তিরক্ষার ভার ফৌজদারী আহেলকারের হস্তে ন্যস্ত আছে। নগরে ৩০ জন চৌকিদার আছে, প্রায় ২১৭০ টাকা চৌকিদারী টেক্স আদায় হইয়া থাকে। সাধারণের ব্যবহার জন্য তিনটী পায়খানা আছে এবং তাহা পরিষ্কারের জন্য ৬ জন মেথর নিযুক্ত আছে, তাহারা বাজারও পরিষ্কার করে। নগরের প্রত্যেক রাস্তার চৌমাথার নিকট এক একটী বাতি দেওয়া হয়, তাহাতে সমস্ত সহর কথঞ্চিৎ আলোকিত হইয়া থাকে। বিগত বৎসর এক অত্যুচ্চ ঘণ্টাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ৬ জন কুলি পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। একটী দমকল কতকগুলি অগ্নিনিবারক এবং ঘরে উঠিবার যন্ত্র আনা হইয়াছে। কোন স্থানে আগুন লাগিলে ঘণ্টাপড়ে এবং ঐ সকল লোক তথায় যাইয়া অগ্নি নিবারণের চেষ্টা করে। আট জন লোক এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহাদের তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন ওবারসিয়ার আছেন, তিনি চৌকিদারী টেক্সও আদায় করিয়া থাকেন।

এই সককল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ ব্যতীত ফৌজদারী আহেলকারকে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধরণ কার্য্য করিতে হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫টি মহাল ওয়ার্ডসের অধীনে আছে, তন্মধ্যে ৫০টীর উত্তরাধিকারী অনুপযুক্ত বিধায়ই

ওয়ার্ডসে আছে, অপর ২৫টী দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী-জন্য আবদ্ধ আছে* ।

জেলখানার পর্য্যবেক্ষণভারও ফৌজদারী আহেল-কারের হস্তে ন্যস্ত আছে। জেলখানাতে গড়ে ১৮০ জন কয়েদী বৎসর অবস্থিতি করে। কয়েদীগণ নগরের জঙ্গলাদি পরিষ্কার করে, সময়ে সময়ে পূর্ত্তবিভাগের কার্য্য করে এবং ছাপাখানার কাজ করে। বৃদ্ধ কয়েদীদিগকে জেলখানার বাগানে কাজ করিতে হয়। প্রায় ৩০।৩৫ জন কয়েদী রুটি, তৈল, সুড়কি, ময়দা প্রস্তুতি এবং সুত্র-ধরের কাজে লিপ্ত থাকে। বৎসরে গড়ে ৮০০০ টাকা কয়েদীদিগের পরিশ্রমে আয় হইয়া থাকে এবং ১৬০০০ টাকা তাহাদের জন্য ব্যয় হয়। অল্প বয়স্ক কয়েদীদিগের শিক্ষার জন্য একটী পাঠশালা আছে, তথায় প্রত্যহ প্রাতে দুই ঘণ্টাকাল কয়েকজন কয়েদী অধ্যয়ন করে, একজন কয়েদীই শিক্ষকের কার্য্য করে।

দুই বৎসর যাবৎ গবোৎপাদক কার্য্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। কয়েকটী ষাঁড় এবং গাভী পশ্চিমদেশ হইতে আনা হইয়াছে। এদেশীয় গাভীগণ নিতান্ত ক্ষীণবল; বলবান বৃষের ঔরসে বলবান্ গরু জন্মিয়া ক্রমে দেশে সবল গরুর প্রচলন হইবে, এই উদ্দেশ্যেই এই কার্য্যটী আরম্ভ হইয়াছে। সদরে ৩টী এবং প্রত্যেক মহকুমাতে

* সম্প্রতি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ভার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। অনেকগুলি মহাল ত্যাগ করা হইয়াছে। ৪।৫টী মাত্র রাখিয়া, তাহাদের তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন মেনেজার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

একটী করিয়া ষাঁড় আছে। যে সকল বৎস হয়, তাহা উপযুক্ত যত্ন অভাবে এখন পর্য্যন্ত তত সবল হয় না*।

ফৌজদারীবিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১৮৩০৭ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

শিক্ষাবিভাগ।

বর্ত্তমান সময়ে নানাপ্রকারের ৩১৮টী স্কুল আছে এবং তথায় ৯২৬০টী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়; এই বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে। ১৮৫৯ খৃঃ গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরের পূর্ব্বোত্তর সীমানার এজেণ্ট্ মহামতি জেঙ্কিন্স্ সাহেবের নামানুসারে এই স্কুলের নাম হইয়াছে; এই স্কুল হইতে অনেক ছাত্র প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। এই স্কুলের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ রাজকীয় ৫০০০ টাকা বার্ষিক ব্যয় হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত একটী প্রথম শ্রেণীর নর্ম্মাল-স্কুল আছে। অন্যান্য স্কুলের মধ্যে দুইটী মডেল বিদ্যালয় কেবল রাজকীয় ব্যয়েই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অপর ৪টী মাইনর স্কুল, ৮২টী মধ্যম বঙ্গস্কুল এবং ১২২টী উচ্চ পাঠশালা, ২১টী রজনী-বিদ্যালয়, ৩১ টী বালিকা বিদ্যালয়

* সম্প্রতি কৃষি ও বনবিভাগ নামে, একটী নূতন বিভাগ সংস্থাপিত হইয়াছে। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, যিনি ইংলণ্ডে কৃষি বিদ্যাবিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই এই বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। গবোৎপাদক কার্য্যালয়ের কার্য্য এই বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য রাজকোষ হইতে প্রায় অর্দ্ধ পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়, অপরার্দ্ধ গ্রামিক লোকেরা প্রদান করে।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিদ্যালয় আছে, তাহাতে সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হয় না। কেবল স্থানীয় লোকের সাহায্যেই চলিতেছে। তন্মধ্যে ৩টী মধ্যম বঙ্গ, ৩০টী উচ্চ পাঠশালা ৪টী রজনী এবং ২টী বালিকা বিদ্যালয়।

রাজার জ্ঞাতি কুটুম্বাদির নিবাসের জন্য একটী ছাত্রাবাস আছে, রাজকীয় ব্যয়ে তথাকার ছাত্রবৃন্দের খরচাদি চলে। ছাত্রেরা তথায় থাকিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করে। ইহা ব্যতীত আর একটী বোর্ডিং স্কুল আছে, তাহা বাঁকিপুরে অবস্থিত, তথায় কয়েকজন রাজগণ আছেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা কার্য্য তত্ত্বাবধারণ জন্য, একজন তত্ত্বাবধায়ক আছেন।

রাজার লাইব্রেরী নামে একটী বিস্তৃত পুস্তকালয় রাজধানীতে অবস্থিত আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর ২০০০ টাকা মূল্যের পুস্তক আনীত হয়।

শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক তিনজন ডিপুটী তত্ত্বাবধায়ক এবং ৪ জন পাঠশালা তত্ত্বাবধায়ক আছেন। গড়ে প্রতি বৎসর শিক্ষাবিভাগের জন্য রাজার ৬০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

এই সকল স্কুল ব্যতীত একটী শিল্প বিদ্যালয় রাজধানীতে সংস্থাপিত আছে; তাহাতে কর্ম্মকার, সুত্রধর এবং অন্যান্য শিল্পকার্য্য শিক্ষা হইয়া থাকে। ১৮৬৯

খৃঃ এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হয়। ১৮৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত শিক্ষা-বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের হস্তে ইহার কার্য্য-ভার ন্যস্ত ছিল, ঐ সময় হইতেই পূর্ত্তবিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

চিকিৎসা বিভাগ।

রাজ্যের এবং রাজধানীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন সিবিলসার্জ্জন আছেন। রাজ্যের বিভিন্নস্থানে নিম্নলিখিত কয়েকটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ১। সদর; ২। মাথাভাঙ্গা; ৩। মেকলীগঞ্জ ৪। দীনহাটা। প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যভার এক এক জন নেটিব ডাক্তরের হস্তে ন্যস্ত আছে। কেবল সদর চিকিৎসালয়ের জন্য একজন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আছেন। এতদ্ব্যতীত সহরের উপর কয়েদী; পুলিস ও সৈন্যদিগের চিকিৎসা জন্য দুইটী চিকিৎসালয় আছে। ইহার কার্য্যের ভার একজন নেটিব ডাক্তরের হস্তে অর্পিত আছে।

সংক্রামক জ্বর, বসন্ত, ওলাউটা, বাত, উপদংশ, আমাশয়, প্লীহা, চর্ম্মরোগ প্রভৃতি রোগই এ প্রদেশে প্রধান। দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসা জন্য গড়ে দশ আনা ব্যয় হইয়া থাকে। গড়ে প্রতি বৎসর এই বিভাগের জন্য অন্যূন ২৫০০০ টাকা ব্যয় হয়।

কয়েক বৎসর গত হইল এখানে গোমস্থূর্য্যাধান পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। সম্প্রতি আর কেহ বাঙ্গালা টীকা

দিতে পারে না। রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ লোকের নূতন প্রণালীতে টীকা হইয়াছে, শীঘ্রই সমুদয় লোকের টীকা দান কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

পুলিস বিভাগ।

বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ আছেন।

১ জন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।
৩ ,, ইন্‌স্পেক্টর্।
৯ ,, সব্ ইন্‌স্পেক্টর্।
২৪ ,, হেড্ কনেষ্টবল্।
২৫৯ ,, কনেষ্টবল্।

রাজ্য মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী থানা আছে।

১, কোতয়ালী। ২, তুফানগঞ্জ। ৩, দীনহাটা। ৪, মাথাভাঙ্গা। ৫, মেকলীগঞ্জ। ৬, হলদিবাড়ী। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী আউট্‌পোষ্ট্ আছে।

১, খোলটা। ২, ভৈষকুচী। ৩, কোটভাজনী। ৪, ক্ষেতি। ৫, শীতলখুচী। ৬, সীতাই। ৭, গীতলদহ।

১৫৫৯ জন গ্রাম্য চৌকিদার আছে। গ্রামিক লোকেরাই তাহাদের বেতন প্রদান করে। গবর্ণমেণ্টের অধীন প্রদেশ সমূহে প্রচলিত চৌকিদারী আইন রাজ্য মধ্যে প্রচলন করিবার প্রস্তাব হইতেছে। বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার পুলিসের কাজ কর্ম্ম এস্থান হইতে কিছুই বিভিন্ন নহে, কাজেই তাহার পৃথক বিবরণ দেওয়া গেলনা।

এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ৪৮০০০ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

সৈন্যব্যূহ।

রাজসম্মান রক্ষার জন্য এখানে একদল সিপাহী সৈন্য আছে, তাহাদের সংখ্যা ৮০ জন মাত্র। তাহাদের প্রধান তত্ত্বাবধায়ককে সুবেদার মেজর বলে। অধিকাংশ সিপাহী পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কেবল ৫ জন মাত্র অশ্বারোহী আছে। আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদ্বারা সহায়তা করিবেন কাজেই এখানে অধিক সৈন্য রাখার আবশ্যকতা নাই। সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক প্রায় ১৩৮০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

পূর্ত্তবিভাগ রাজপথ ইত্যাদি।

বাণিজ্য ও সর্ব্বসাধারণের গমনাগমনের সুবিধার জন্য রাজ্য মধ্যে অনেকগুলি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত আছে এবং পথের মধ্যবর্ত্তী নদী সকলে কাষ্ঠময় ও লৌহময় সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ভদ্রলোকের বিশ্রাম জন্য মধ্যে মধ্যে ডাকবাঙ্গালা আছে। এতদ্ব্যতীত নগর মধ্যে যে-সকল অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তাহা মেরামত এবং নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ পূর্ত্তবিভাগের সৃষ্টি। এই বিভাগ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগের তত্ত্বাবধারণ জন্য একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী আছেন। নূতন রাজবাটী নির্ম্মাণের কার্য্যই কেবল এই বিভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্যভার একজন বাঙ্গালীর হস্তে ন্যস্ত আছে। তাঁহার একজন সহকারী এবং কয়েক-জন ওবারসিয়র্ এবং সব্ ওবারসিয়র্ আছেন। গড়ে

প্রতি বৎসর প্রায় তিন লক্ষ টাকা এই দুই বিভাগে ব্যয় হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত রাজপথ সকল বর্ত্তমান আছে।—

বিহার	হইতে	হলদিবাড়ী	৪৩	মাইল	
বিহার	,,	খেড়বাড়ী	১৯	,,	এই পথ ধুবড়ি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
বিহার	,,	গীতলদহ	২২	,,	,, রঙ্গপুর ,,
বিহার	,,	খোল্‌টা	১২	,,	,, বাক্সা ,,
বৌতিপথ	,,		৪		
বিহার	,,	লাউকুঠী	২৬	,,	ইহার এক শাখা ফলিমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
দীনহাটা	,,	মেকলীগঞ্জ	৪০	,,	
মাথাভাঙ্গা	,,	শীতলখুচী	১২	,,	
বিহার	,,	গোসানিমারী	১৪	,,	
বিহার	,,	কালীঘাট	২	,,	
পূর্ব্বভাগপথ			১২	,,	
সীতাইপথ			৬	,,	
বিহার	,,	শুক্টাহাট	২	,,	
বিহার	,,	শিশবতলা	২	,,	
মেকলীগঞ্জ	,,	চাঙ্গরাবান্ধা	৫½	,,	
দেওয়ানগঞ্জ	,,	পশ্চিমপথ	৩	,,	
হলদিবাড়ী	,,	কাশিয়াবাড়ী	২½	,,	
সীতাই	,,	দুর্গাপুর	৭	,,	
চৌধুরীরহাট	,,	বামনহাট	২	,,	
তুফানগঞ্জ	,,	লাউকুঠীরসড়ক	৪½	,,	
হলদিবাড়ী	,,	মাণিকগঞ্জ	৩½	,,	
বলরামপুর	,,	দীনহাটা	১২½	,,	
সাগরদীঘীপথ			৩	,,	
ফালাকাটাপথ			৬	,,	
বিহার	,,	গুদাম	২	,,	
বানেশ্বরপথ			২	,,	
পাটগ্রাম	,,	যোরজারহাট	১৫½	,,	

বিহার হইতে হলদিবাড়ী পর্য্যন্ত পথে অনেকগুলি কাষ্টময় সেতু আছে; তন্মধ্যে টানাটানী, চেনাকাটা, ধল্লা, সানিয়াজান, বুড়া তিস্তা প্রভৃতি নদীর উপর যে সকল সেতু আছে, তাহাই প্রধান। লাউকুঠীর পথে ঘড়ঘড়িয়া ও গদাধর নদীর উপর কাষ্ঠময় সেতু আছে। রঙ্গপুরের পথে কালীঘাটের নিকট তোর্ষানদীর উপর সুনীতিপুল নামে একটী লৌহসেতু সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৫৭০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সেতুটীর দৈর্ঘ্য ২৪০ ফুট। এই পথে মানসাই নদীর উপর কাষ্ঠময় সেতু আছে।

হলদিবাড়ী, মেকলীগঞ্জ, বালাহাট, মাথাভাঙ্গা, গীতলদহ, দীনহাটা প্রভৃতি স্থানে ডাকবাঙ্গলা আছে।

PART II.

MYTHOLOGICAL PERIOD.

দ্বিতীয় খণ্ড।

কাল্পনিক সময়।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় কোনও দেশের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইলে এমন কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না যে, তাহারউপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে। যদিচ কোন কোন গ্রন্থকার তাঁহাদের হস্তলিপি ও অন্যান্য পুস্তকে কিছু কিছু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও অনেক স্থলে কাল্পনিক বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং পুরাকালের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইলে দেশ প্রচলিত প্রবাদ ও গাথার উপর অনেক নির্ভর করিতে হইবে। আমরা যে সময়ের যে বিবরণ আরম্ভ করিলাম তাহার ভিত্তিমুল নিতান্ত অপ্রামাণিক ও কাল্পনিক। তথাপি দেশীয় প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কোচবিহারের ইতিহাস লিখিতে হইলেই বর্ত্তমান রাজবংশের রাজত্বের পূর্ব্বে ইহার কিরূপ অবস্থা ছিল তদ্বিবরণ জানা আবশ্যক। আমরা অগ্রে সেই বিবরণ প্রকটন করিতেই যত্ন করিলাম।

অনেকেই অবগত আছেন যে কামরূপ একটী প্রাচীন রাজ্য। পণ্ডিতবর রজনীকান্ত গুপ্ত তদীয় ভারত ইতিহাসে লিখিয়াছেন "কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর। সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের পিতামহ দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এস্থানে আসিয়া এরাজ্য জয় করিয়াছিলেন"। রাজা রঘু ত্রেতাযুগের লোক, সেই সময়ের এদেশীয় বিবরণ আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিনাই, কোন প্রবাদও প্রচলিত নাই, কাজেই আমরা সেই বিষয়ে মতামত

প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কামরূপকে পূর্ব্বে প্রাগ্ জ্যোতিষ্পুর বা প্রাক্‌দেশ বলিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই; এই বিষয় পরেও উল্লেখ করা যাইবে।

পুরাকালে সমুদয় আসাম বিভাগ, রঙ্গপুর ও রাঙ্গামাটী বিভাগ, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের কতক অংশ এবং কোচবিহার বিভাগে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। কামরূপে তাঁহার রাজধানী ছিল এবং এই রাজ্যকে কামরূপ রাজ্য বলিত।

কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী পুত্র নরককে কামরূপের রাজত্ব প্রদান করেন। যদিচ নরক অসুর ছিলেন, কিন্তু দেবতাগণ তাঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিতেন। এবং তাঁহার হস্তে কামাখ্যার মন্দির রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। কামাখ্যা হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। নরক কামাখ্যায়ই বাস করিতেন এবং ভগবতীর মন্দিরের তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

এই সময়ে কামরূপ চারি অংশে বিভক্ত ছিল, তাহার প্রত্যেক অংশকে পীঠ বলিত যথাঃ—কামপীঠ, রত্নপীঠ, সুবর্ণপীঠ, চুমারপীঠ। কোচবিহার, রত্নপীঠ নামক বিভাগের অন্তর্গত ছিল। নরক অনেক দিন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র থাকিতে পারিলেন না; তিনি অত্যন্ত প্রজা পীড়ক ছিলেন এবং মহাদেবের উপাসনা করিতেন, কাজেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার পুত্র ভগদত্তকে কামরূপের রাজত্ব প্রদান করিলেন।

আমরা অনেক স্থলে ভগদত্তের উল্লেখ পাইয়াছি। মহাভারতের সভাপর্ব্বে উল্লিখিত আছে, অর্জ্জুন দিগ্বিজয় উপলক্ষে কামরূপ জয় করিতে যান, তথায় ভগদত্তের

সঙ্গে তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উক্ত পর্ব্বে ভগদত্ত বিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে ও তাঁহার সৈন্য সমূহের যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভগদত্ত এতদ্দেশীয় রাজা ছিলেন।

দ্রোণপর্ব্বে উল্লিখিত আছে, ভগদত্ত দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুন হস্তেই নিধন প্রাপ্ত হন। আইন আক্‌বরীতেও ভগদত্তের বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। আইন আক্‌বরীতে আরও উল্লেখ আছে যে, ভগদত্তের মৃত্যুর পর ঐ বংশীয় ২৩ জন ভূপতি যথাক্রমে কামরূপ রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা দুষ্কর, কেননা এই গ্রন্থের মতানুসারে ভগদত্তের বংশধরেরা সমগ্র বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা হইয়া পড়েন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সঙ্গত বোধ হয় না।

তন্ত্র মতে এই রাজবংশের বিবরণ যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহাও সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ নহে। তন্ত্রে ভগদত্তের বিশেষ উল্লেখ নাই। কোনও তন্ত্রমতে উক্ত বংশীয় জল্পেশ্বর নামক ভূপতি জলপেশ নামক স্থানে শিব মন্দির প্রস্তুত করেন; অদ্যাপি সেই মন্দির বর্ত্তমান আছে। এই জলপেশ জলপাইগুড়ী জেলার অন্তর্গত। এখানে শিব-চতুর্দ্দশী উপলক্ষে এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। অন্য তন্ত্র মতে এই মন্দির শুদ্র বংশীয় রাজাদিগের স্থাপিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কোন কোন তন্ত্র মতে নরকের বংশ বিলুপ্তিরপরই শুদ্রবংশীয় রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করেন।

এই বংশের পৃথু রাজা বিলক্ষণ খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। চাকলা বোদা ও বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে তাঁহার রাজধানী ছিল। সেই রাজধানী মৃণ্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শুদ্র বংশীয় রাজগণ যে সমুদয় কামরূপ শাসন করিতেন, এরূপ সম্ভব হয় না। এই সময়ে আসাম বিভাগের অনেক অংশ বিভিন্ন হইয়া পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়।

শুদ্র বংশের পরেই পাল বংশীয় নৃপতিগণ এরাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই পাল বংশীয়েরা বাঙ্গলার বৈদ্য বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী পাল বংশীয়দিগের বংশ সম্ভূত বা সম্পর্কান্বিত বলিয়া অনুমিত হয়। এ বংশের প্রথম রাজা ধর্ম্মপাল। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিত আছে "পাল বংশের প্রথম রাজা ভূপাল, তৎ-পুত্র ধর্ম্মপাল হিমালয় প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন। দিনাজপুরে মহীপালের দীঘী অদ্যাপি মহীপাল নামক রাজার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।" অদ্যাপি ডিম্-লার কয়েক মাইল দক্ষিণে ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাব-বশেষ পতিত রহিয়াছে। ধর্ম্মপালের রাজত্ব পশ্চিম দক্ষিণে দিনাজপুর, বগুড়া এবং উত্তর পূর্ব্বে তেজপুর

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; ইহা কয়েকখানি তাম্রশাসন ও তৎকালীয় মুদ্রাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে। ধর্ম্মপালের পুরাতন নগর জেলা রঙ্গপুরে তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা কোচবিহারের সীমান্ত প্রদেশ হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

মীনাবতী নামে ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃজায়া ছিলেন। ধর্ম্মপাল নগরের দুই মাইল পূর্ব্বদিকে তাঁহার দুর্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিনি তদীয় পুত্র গোপীচন্দ্রের পক্ষে ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং এক যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। পরে আর ধর্ম্মপালের বিষয় কিছু শুনা যায় না। গোপীচন্দ্র রাজা হইলেন বটে, কিন্তু সমুদয় ক্ষমতা মীনাবতীর হস্তেই রহিল। তিনি কয়েক দিবস রাজত্ব করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তৎপুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। রাজা ভবচন্দ্র ও তদীয় মন্ত্রীর বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে।

রাজা অসময়ে তদীয় উপাস্য দেবতার গৃহে প্রবেশ করিলে, দেবী ক্রোধপরবশা হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন যে "রাজা ও মন্ত্রীর সাধারণ বুদ্ধি লোপ পাইয়া যাইবে।" তাঁহারা সাধারণ লোকের মত কোন কাজ করিতেন না ; দিনের বেলায় নিদ্রা যাইতেন, রাত্রিতে জাগরিত থাকিতেন। মন্ত্রী এক বাক্সের ভিতর বদ্ধ থাকিতেন, কঠিন বিষয়ের পরামর্শ আবশ্যক হইলে মন্ত্রীকে মুক্ত করা হইত। রাজা ও মন্ত্রীর দুই একটী বিচারের কথাও এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। বোঝাই নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে কোন ব্যবসায়ী রাজার নিকট আবেদন করিল।

রাজা মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কুম্ভকারকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ করিলেন; কারণ 'কুম্ভকার ধূমোৎপাদন করিয়াছে তদ্দ্বারা মেঘ ও ঝড়ের সৃষ্টি হইয়া ব্যবসায়ীর নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। একদা দুই পথিক কোন পুষ্করিণীর নিকট উনন খনন করিয়া পাক করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই দুই ব্যক্তি গুপ্তভাবে মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীটী অপহরণ করিবে, এই মানসে এইরূপ কার্য্য করিতেছে সুতরাং তাহাদিগকে চোর মনে করিয়া শূলে চড়াইতে আদেশ দিলেন। শূল প্রস্তুত হইলে উপায়হীন পথিকগণ প্রত্যেকেই বড় শূলে যাওয়ার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল মহারাজ! আমরা দৈবশক্তি প্রভাবে জানিতে পারিয়াছি যে এই শূল দুইটী বিলক্ষণ শুভক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার বড় শূলে যে আরোহণ করিবে পর জন্মে সে সমুদয় পৃথিবীর রাজা হইবে; এবং ছোট শূলে আরোহণ করিলে মন্ত্রী হইবে।' ইহা শুনিয়া রাজা এবং তদীয় মন্ত্রী শূলে আরোহণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন*। পরে পল নামক একব্যক্তি রাজপদ গ্রহণ করেন। তিনি এই বংশের শেষ রাজা। অনন্তর কান্তেশ্বর রাজবংশ প্রাদুর্ভূত হইল।

* বাঘ দুয়ার পরগণার অধিবাসী বাবু বিপিনবিহারী চন্দ ভবচন্দ্র রাজার বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া উল্লিখিত জন প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

নীলধ্বজ নামক কোন ব্যক্তি পাল বংশীয় শেষ রাজাকে বিনাশ করিয়া তদীয় সিংহাসন অধিকার করেন। নীল ধ্বজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিম্বদন্তী আছে। ইনি শৈশবে কোন এক ব্রাহ্মণের গো রক্ষক ছিলেন। মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং নিদ্রাভিভূত থাকাতে, গো সকল নিকট-বর্ত্তী ক্ষেত্র সমূহের শস্যাদি অপচয় করে; তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ক্রোধপরবশ হইয়া ভৃত্যকে শাসন মানসে তৎসমীপে উপ-স্থিত হইলেন, এবং সামুদ্রিক জ্যোতিষ বলে জানিতে পারিলেন যে, ভৃত্য সাধারণ বালক নহে, তাহার শরীরে রাজ চিহ্ন আছে; পরে ব্রাহ্মণ এই সমুদয় বিষয় ভৃত্যকে অবগত করাইলেন। কালক্রমে ভৃত্য রাজা হইলেন। কিন্তু কি প্রকারে রাজা হইলেন তৎসম্বন্ধে কোন প্রবাদ নাই। তিনি রাজা হইয়া আপন পূর্ব্ব প্রভু ব্রাহ্মণকে মন্ত্রী করিলেন। ইনিই মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া কামরূপে সংস্থাপন করেন। এবং গোসানিমারীতে কান্তা-পুর নগরের সন্নিবেশ করেন। নীলধ্বজের পর চক্রধ্বজ ও তদনন্তর নীলাম্বর রাজা হন। ইনিই এই বংশের শেষ রাজা। ইনি সাধারণতঃ কান্তেশ্বর নামে বিখ্যাত ছিলেন। গোসানী মঙ্গল নামে একখানা লিখিত গ্রন্থ ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লিখিত আছে যে, প্রথমে শ্রীবৎস রাজা কামরূপে রাজত্ব করিতেন, পরে ভগদত্তের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ভগদত্তের বংশ বিলুপ্তির পর কয়েক বৎসর অরাজক ছিল। পরে মহাদেব জাম-বাড়ী গ্রামের

ভক্তেশ্বর নামক ভক্তের এবং তদীয় পত্নী অঙ্গনার* প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কান্তেশ্বর নামক পুত্র প্রদান করেন। এই কান্তেশ্বরই আদি ও শেষ রাজা। এই পুস্তক মতে ধর্ম্মপাল নামক নগর এই রাজার নির্ম্মিত। কিন্তু এতাদৃশ পুস্তকের কিছুই বিশ্বাস যোগ্য নহে, কেননা উহা কেবল উপাখ্যানেই পরিপূর্ণ।

কান্তেশ্বরের রাজত্বকালে কামরূপ রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ এবং ঘোড়াঘাটস্থিত দুর্গ এই রাজার নির্ম্মিত। বিহার হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে কান্তাপুর নামক স্থানে যে সকল পুরাতন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে, তাহা কান্তেশ্বরের বাটী বলিয়া বিখ্যাত। অদ্যাপি বাটীর প্রাচীর সকল অক্ষুণ্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজবাটী, রাজবর্ত্ম, দীর্ঘিকা, প্রভৃতি যে সকল কীর্ত্তি ভগ্ন ও জীর্ণাবস্থায় পতিত আছে, তদ্দৃষ্টে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় যে, পুরাকালে এই স্থানে কোন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার রাজধানী ছিল। রাজা কান্তেশ্বরের সময়ের প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা অদ্যাপি এ প্রদেশের স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে†। এমন আরো অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান আছে যে তদ্দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে, তাঁহার রাজত্ব কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

* মূল পুস্তকে রঙ্গনা লিখিত আছে এদেশে "অ" কে "র" এবং "র" কে "অ" বলিয়া থাকে তাহা হইতেই বোধ হয় রঙ্গনা নাম হইয়াছে।

† এক সময়ে ১৩ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুদ্রাগুলি একটী কূপমধ্যে প্রোথিত ছিল। সেই কূপ যখন নদীতে ভাঙ্গিয়া নেয় তখন এই মুদ্রা পাওয়া যায়।

রাজা কান্তেশ্বর স্বাভাবিক সন্দেহ বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, এক দিবস অন্তর্ব্বাটীতে পুরুষ যাতায়াতের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন এবং বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা অবিলম্বে 'এই গুপ্ত প্রবেশকারীকে ধরিয়া আন। প্রহরীগণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে প্রকাশ পাইল যে, গুপ্ত প্রবেশকারী মন্ত্রী শচীপত্রের পুত্র, মহারাণীর প্রণয় পরতন্ত্র হইয়া অন্তঃপুরে যাতায়াত করেন। রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া মন্ত্রী পুত্রকে গোপনে নিহত করিলেন। পরে এক নিমন্ত্রণের আয়োজন করিয়া নিহত ব্যক্তির শরীরের কতক মাংস পাক করাইলেন এবং মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শচীপত্র পুত্র হত্যার বিবরণ বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিলেন না। তিনি নিঃসন্দেহে আহার করিতে বসিলেন; ভোজনান্তে রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন মাংস কেমন হইয়াছে। মন্ত্রী বলিলেন বিশেষ সুখাদ্য হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুত্রের মুণ্ড বস্ত্রাবৃত করিয়া তাঁহার সঙ্গে দিলেন এবং বলিলেন যে তোমার জন্য আরও মাংস রাখিয়াছিলাম, তাহা বাটীতে নিয়া যাও, মন্ত্রী বাটী আসিয়া মাংসের বস্ত্রাবরণ মুক্ত করিলেন, এবং স্বকীয় পুত্রের ছিন্ন মস্তক দর্শনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু শোকে বিহ্বল না হইয়া, ইহার প্রতিশোধ দিবার উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। পর দিবস প্রাতে রাজ সভাতে যাইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে রাজাকে বুলিলেন, মহারাজ! আমার পুত্র অপরাধী সত্য; তাহাকে যে বিনাশ করিয়াছেন তাহাতে আমার অনুমাত্রও আক্ষেপ

নাই, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী আমাকে গোপনে পুত্রমাংস ভোজন করান আপনার পক্ষে ন্যায়ানুগত ও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। সুতরাং আমি আর আপনার কাজ করিতে ইচ্ছা করিনা, এই বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এবং সন্যাসী বেশে গৌড় নগরে মুসলমান সুবাদারের নিকট উপস্থিত হইলেন। মুসলমান সুবাদার কান্তেশ্বর রাজের রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা সুচারুরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সন্যাসীর প্রবর্ত্তনায়, রাজ্য লোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইলেন। তিনি সেনাপতিকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এ রাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ঘোড়াঘাট নামক স্থান দুর্গ বদ্ধ করিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মুসলমানেরা রাজা কান্তেশ্বরকে আক্রমণ করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার দুর্গ এরূপ দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, তাহাদের আক্রমণ নিষ্ফল হইল। ১২ বৎসর অবরোধের পরও মুসলমান সেনাপতি কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে মুসলমান সেনানায়ক বল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছলের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। কান্তেশ্বরের নিকট এক দূত প্রেরিত হইল, দূত মুখে কান্তেশ্বরকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমাদের এরাজ্য অধিকারের সমুদয় আশা বিফল হইয়াছে। আমরা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিনা। সন্ধি হইলে পর বন্ধুভাবে আমরা আপনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত আছি। কান্তেশ্বর সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; পরে সন্ধির নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইল; মুসলমান সেনাপতি বলিলেন মহাশয় বিদায় কালে আমাদের সঙ্গীয় স্ত্রীলোক

সকল আপনার অন্তর্ব্বাটীস্থ মহারাণীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আদর সম্ভাষণ ও উপযুক্ত সম্মান প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রাজা তাহাতেও সম্মত হইলেন। মুসলমান সেনাপতি বহুবিধ শিবিকা দুর্গ মধ্যে প্রেরণ করিলেন। শিবিকার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও তাহার বাহকগণ বাহকবেশধারী সৈনিক পুরুষ। তাহারা লব্ধপ্রবেশ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিল এবং অনায়াসে দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইল। এবং রাজাকে বন্দী করিয়া লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিল। সুবাদারের সন্তোষার্থে লৌহ পিঞ্জর গৌড়-নগরে প্রেরিত হইল; পথি মধ্যে কান্তেশ্বর পলায়নের চেষ্টা করিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার সমুদয় যত্নই বিফল হইল। পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঘোড়াঘাট নিবাসী মুসলমানেরা বলে যে তাহাদের শাসনকর্ত্তা ইস্মাইলগাজী কান্তেশ্বরকে পরাজয় করেন, কিন্তু ইহা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ ইস্মাইল-গাজী নছরত সাহার রাজত্ব সময়ে ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন ১৫২৩ খৃঃ অব্দে নছরত সাহার রাজত্ব আরম্ভ হয়, কিন্তু কান্তেশ্বরের পরাজয় ইহার অনেক পূর্ব্বে প্রায় ১৪৯৬ খৃঃ অব্দে হোসন সাহ কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছিল। ডাক্তর বুকানন সাহেবও এইমত সমর্থন করিয়াছেন। ঘোড়া-ঘাটের মুসলমানেরা ইস্মাইল গাজীর প্রতি প্রবল ভক্তি বশতই এরূপ বলিয়া থাকে।

এস্থলে কান্তেশ্বরের বাটীর একটী বিবরণ বিবৃত করা কোন মতেই অসঙ্গত বোধ হয় না। কান্তাপুর পূর্ব্বে ধল্লানদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ছিল এবং এই নদীই

এক পার্শ্বের রক্ষক স্বরূপ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে নদীর গতি পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজধানীর পূর্ব্বদিকে যে পুরাতন সোতা দৃষ্ট হয় তদ্দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্ব কালে এস্থলে বৃহৎ নদী ছিল।

সিংমারী নদী নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রবেশ এবং নির্গমন স্থানের পুরাতন কীর্ত্তি সকল বিনষ্ট করিয়াছে। এরূপ অনুমিত হয় যে যখন এস্থলে লোক বাস করিত তখন ইহার বেগ বড় প্রখর ছিল না এবং নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেও পারে নাই। বাঁধ ইত্যাদি দ্বারা ইহার বেগ নিবারণ করা যাইত। নগরটী সুন্দর আয়ত ক্ষেত্রের ন্যায় প্রায় ২০ বিশ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল। সীমান্ত ভুভাগের প্রায় পাঁচ মাইল স্থান ধল্লা নদী দ্বারা এবং অবশিষ্ট অংশ মৃণ্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীরের উভয়দিকে দুই পরিখার চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হয়। বোধ হয় যে মধ্যের পরিখার মৃত্তিকা দ্বারা প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এবং বাহিরের পরিখার মৃত্তিকা সকল বহির্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কারণ বাহিরের পরিখার বহির্দ্দিকের স্থান সকল ক্রমশই ঢালু। মধ্যের পরিখার গভীরতা সকল স্থানে সমান নহে, বোধ হয় কৃষি কার্য্যের সুবিধার জন্য এরূপ অসমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ প্রস্তুত কালীন তাদৃশ ছিল কিনা সন্দেহ। প্রাচীর ভূমির দিকে প্রায় ১৩০ ফিট প্রশস্ত এবং উচ্চতা প্রায় ২০ বিশ হইতে ৩০ ত্রিশ ফুট। কিন্তু উচ্চতা কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে এবং ভূমিরদিকে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ কেল্লার বহির্দ্দিকে ধৌত

মৃত্তিকা সংযোগে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। প্রাচীর মৃত্তিকা নির্ম্মিত, তাহাতে যে ইষ্টক ছিল এরূপ বিবেচনা হয়না। কিন্তু স্থানে স্থানে যে সকল ইষ্টক খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই প্রাচীরের উপরিভাগে বক্ষসম উচ্চ এক ইষ্টক গ্রথিত প্রাচীর ছিল, কালে নষ্ট হইয়াছে। বাহিরের পরিখা প্রায় ২৫০ ফিট প্রশস্ত ছিল, বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে ইহার গভীরতা স্থির করা দুঃসাধ্য। কিন্তু বহির্দ্দিকের ঢালু স্থানের পরিমাণ কল্পনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে যে ইহা অতিশয় গভীর ছিল। প্রাচীর সোজা ভাবে বিস্তৃত। কিন্তু ইহার সকল বাহু সমান নহে এবং ইহার মধ্যে কোন স্তম্ভ, বুরুজ, কি পার্শ্ব নিবেশ নাই ইহার মাত্র তিনটী দ্বার ছিল। বোধ হয় ধল্লা নদীর পশ্চিম তটে আর একটী দ্বার ছিল এবং তৎসন্নিকটেই আক্রমণ কারীরা শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল। নিম্নলিখিত কারণে এস্থলে আর একটী দ্বারের বিষয় কল্পনা করা যাইতে পারে।

১। অন্যান্য দ্বারের নিকট যেমন পরিখা অথচ আরও অনেক কাজ দৃষ্ট হয় এস্থানেও সেইরূপ।

২। একটী পুরাতন পথ ধনাগার হইতে এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে তথা হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই পথের দুই পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। যে সকল ইষ্টক ও প্রস্তর স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রাচীর হইতে তিন মাইল পূর্ব্ব সান্দল দীঘী পর্য্যন্ত এই সকল অট্টালিকা

বর্ত্তমান ছিল। দেশীয় লোকে বলে যে এই সকল প্রাসাদ মোগলদিগের নির্ম্মিত। ইহা কোন মতেই সঙ্গত বোধ হয়না কারণ, গ্রে-নাইট্ প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটী স্তম্ভ কোন ইষ্টক স্তূপের অভ্যন্তরে প্রোথিত আছে এবং অপর একটী স্তূপে ৪টী স্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অনেক সময় অবরোধের পর মুসলমানেরা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু তাহারা গ্রে-নাইট্ প্রস্তর এতদূর হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিল এমত সম্ভবপর বোধ হয়না। কিন্তু আক্রমণ কারীরা নিকটবর্ত্তী হইয়া এই সকল প্রাসাদে বাস করিয়াছিল। এই স্থানের দুই মাইল পশ্চিমে এবং সিংমারী নদীরও প্রায় এক মাইল পশ্চিমে একটী দ্বারের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। দ্বারের নিকট প্রাচীরের মধ্যে ও বহির্দ্দিকে পরিখার অভাব দূর করার জন্য কতকগুলি কাজ ছিল। এইটীর এবং অন্যান্য কাজ ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল। দ্বার প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভের উপর লম্বমান ছিল এই কারণেই ইহাকে শিল দুয়ার বলে। এই সকল প্রস্তরে কোনও খোদিত কারু কার্য্য নাই। এই দ্বারের কিঞ্চিদধিক দুই মাইল দূরে বাঘদুয়ার নামে উল্লিখিত দ্বারের ন্যায় আর একটী দ্বার আছে, দ্বারের প্রবেশ স্থানে ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি ছিল বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে। উত্তরদিকে একটী মাত্র দ্বার আছে ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত এবং ইহাকে হোকোদুয়ার বলে।

এই দ্বারের অব্যবহিত নিকটে এক দুর্গ আছে। ইহার আয়তন প্রায় একবর্গ মাইল এস্থানে মন্ত্রী বাস করিতেন, ইহার প্রাচীর সকল নগরের প্রাচীরের মত

উৎকৃষ্ট নহে মন্ত্রীর আবাসের উত্তরদিকে রাজার স্নান গৃহ ছিল, তাহাকে শীতলাবাস বলে। এস্থলে এখন তামাকের আবাদ হয়। এস্থানে অট্টালিকাদির কোনও চিহ্ন নাই। বোধ হয় স্নানাগার নিকুঞ্জ বনে আবৃত ছিল। তথায় গ্রে-নাইট প্রস্তর নির্ম্মিত এক ঘাট ও ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু সে সকল প্রস্তরে কোন শিল্প চিহ্ন বিদ্যমান নাই।

মধ্যস্থলে পাট অথবা রাজার বসতি স্থানই প্রধান। ইহা চতুষ্কোণ, ইহার চতুর্দ্দিকে ৬০ ফিট গভীর পরিখা, পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৮৬০ ফিট এবং উত্তর দক্ষিণে ১৮৮০ ফিট বিস্তৃত। পরিখার মধ্যে ইষ্টক নির্ম্মিত এবং বহির্দ্দিকে মৃণ্ময় প্রাচীর ছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের প্রাচীর প্রায় পরিখা সংলগ্ন, কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিমে তদনুরূপ নহে। প্রাচীরের বহির্দ্দিকে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীঘী আছে এবং জলা ভুমি দৃষ্ট হয়, এই স্থানেই পূর্ব্বে নদী ছিল এরূপ অনুমিত হয়। অন্য তিনদিকে এই মধ্য দুর্গ অন্যূন তিনশত ফিট প্রশস্ত এক বেষ্টনে পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে মৃণ্ময় প্রাচীর ছিল এবং ইহা তিনভাগে বিভক্ত ছিল। রাজা অন্দরের ভিন্ন ভিন্ন লোকের বাস গৃহের জন্যই এইরূপ স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই বেষ্টন মধ্যে কয়েকটী দীর্ঘিকা দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন অট্টালিকা নাই। বোধ হয় রাজপরিবারগণ সাধারণ গৃহে বাস করিত। মধ্য বেষ্টনের ইষ্টকময় প্রাচীরের মধ্যে উত্তরদিকে একটী আশ্চর্য্য মৃত্তিকা স্তূপ দৃষ্ট হয়, ইহার উপরিভাগ প্রায় ৩৬০ বর্গ

ফুট এবং ৩০ ফুট উচ্চ। ইহার পার্শ্ব ভাগ ইষ্টক গ্রথিত এবং ক্রমশঃ ঢালু, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এরূপ পার্শ্ব অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান আছে এবং তন্নিম্নে একটী দীর্ঘিকা আছে। উল্লিখিত মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যভাগ মৃত্তিকা নির্ম্মিত। নিকটবর্ত্তী যে সকল দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে বোধ হয় মৃত্তিকা স্তূপ প্রস্তুত করার জন্যই তৎসমুদয় উৎখাত হইয়াছিল। ইহার একটী দীর্ঘিকা রাজবাটীর দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশের রক্ষক স্বরূপ ছিল। যেহেতু ইহা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। মৃত্তিকা স্তূপের উপরিভাগে কতকগুলি ইষ্টক দেখা যায় বটে, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার মধ্যভাগ কেবল মৃত্তিকা ও বালুকাপূর্ণ। মৃত্তিকা স্তূপের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটী ইষ্টক গ্রথিত কূপ আছে, তাহার ব্যাস ১০ ফুট। ইহার দুই স্থানে মাত্র অট্টালিকার চিহ্ন পাওয়া যায় এবং জানা যায় যে এই স্থানের ইষ্টক দ্বারা স্থানান্তরে নীলের কুঠী প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে কান্তেশ্বরীর মন্দির ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে এই জনশ্রুতি নিতান্ত অমূলক নহে। পশ্চিম ভাগের মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র আঙ্গিনা আছে, কেহ কেহ বলেন এখানেই রাজার শয়ন গৃহ ছিল। কিন্তু কোনমতে ইহা সঙ্গত বোধ হয় না, কারণ ইহা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং দেবালয়ের অতি নিকটবর্ত্তী সম্ভবতঃ ঐ গৃহে সমারোহের পূজার সময় অন্যান্য কার্য্য হইত। মৃত্তিকা স্তূপের দক্ষিণদিকের স্থান দুই অসমান ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহার মধ্য স্থলে এক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর ছিল। ইহার পূর্ব্বভাগে কতকগুলি ইষ্টক স্তুপাকারে

রহিয়াছে। এই ভাগে মৃত্তিকাস্তূপের মত দীর্ঘ একটী দীর্ঘিকাও আছে, কিন্তু প্রশস্তে তাহার অর্দ্ধেক। কথিত আছে এই দীর্ঘিকাতে রাজগণ ক্রীড়া জন্য কচ্ছপ পোষণ করিতেন। ইহার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে আর একটী ক্ষুদ্র মৃত্তিকা স্তূপ আছে, এস্থানেও অনেক ইষ্টক দৃষ্ট হয়; বোধ হয় এখানে কোন মন্দির ছিল। দীর্ঘিকার পূর্ব্ব-দিকে কতকগুলি রাশীকৃত ইষ্টক স্তূপ দেখা যায়, জনরব আছে, এস্থলে শস্ত্র গৃহ ছিল। পশ্চিম ভাগ আয়তনে ক্ষুদ্র, এস্থানে রাজার বিশ্রাম ভবন এবং দক্ষিণ ভাগে বন্ধুবর্গের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করণের স্থান নিরূপিত ছিল। ও উত্তর ভাগে রক্ষিতা স্ত্রীগণ বাস করিত। এস্থানের কতক অংশ দক্ষিণ ও উত্তরে ইষ্টক প্রাচীরে এবং পশ্চিমে মৃণ্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল এবং উত্তর দিকে একটী মৃত্তিকা স্তূপ ছিল, এস্থানেই সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকদিগের মন্দির ছিল। এস্থানেও দুইটী পুষ্করিণী আছে। তাহার প্রান্তভাগ ইষ্টক রচিত। এই দীর্ঘি-কার নিকট রাজ মন্দির ছিল। পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকের অন্দর মহলের কথা হইয়াছে, তৎসন্নিকটে বৃহৎ একটী অট্টালিকা ছিল; তাহাতে শান্তিরক্ষকগণ অবস্থান করিত।

এই প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের অনেক স্থানেই প্রস্তর দেখা যায়; কিন্তু ইহা নিতান্ত অপরিষ্কার এবং ভালরূপ খোদিত নহে। ইহার স্থানে স্থানে গ্রে-নাইট প্রস্তর দেখা গিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে যে, এই রাজ বাটী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। কিন্তু বাহিরের মৃণ্ময় প্রাচীর গৃহাধিষ্ঠাত্রী কান্তেশ্বরী দেবী মুসলমানদিগের আক্রমণের

প্রাক্কালে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কান্তেশ্বরী নীলাম্বরকে চারিদিবস উপবাস থাকিতে বলেন, কিন্তু রাজা তিন দিবস মাত্র উপবাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাজেই তিনদিকের প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট অর্থাৎ ধল্লানদীর দিকের প্রাচীর অসম্পূর্ণ রহিল। বাস্তবিক মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য যে অল্প মাত্র সময়ে প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

নগরের মধ্য দিয়া দুইটী পথ পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত কিন্তু সড়ক দুইটী সরল নহে। ইহার পূর্ব্ব সীমা ধল্লানদী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম সীমা বাঘদুয়ার পর্য্যন্ত প্রসারিত। দক্ষিণদিকে রাজার আবাসস্থান পর্য্যন্ত আর একটী অনতিদীর্ঘ সড়ক ছিল। এই সড়কের আভ্যন্তরীণ ভূভাগ চতুষ্কোণ, এস্থানে রাজ কর্ম্মচারীরা বাস করিতেন, এই সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে দুই এক খণ্ড ইষ্টক দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন অট্টালিকা ছিল, এরূপ প্রতীয়মান হয় না। রাজবাড়ীর এক মাইল পশ্চিমদিকে সিংমারী নদী বিদ্যমান আছে।

এই নদীর পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ কান্তেশ্বরের অনেক কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়াছে। নগরের দক্ষিণ ভাগের সমুদয় অংশ, ইহার পূর্ব্বের গতিতে বিনষ্ট হইয়াছে। সিংমারীর অপর পার্শ্বে আর একটী নদী ছিল তাহার উপর ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু ছিল। সেতু গথিক প্রণালীতে নির্ম্মিত।

বাঘদুয়ারের অদূরেই গৌরীপাট নামক একটী স্থান আছে উহা প্রস্তর মণ্ডিত। তথায় দেবাদিদেব মহাদেবের মনোহর প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছে। তাহার

চতুর্দ্দিকে যে সকল ইষ্টক দৃষ্ট হয় তাহাতে বোধ হয় এখানে শিবমন্দির ছিল। মুসলমানেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিয়াছে। এখানে মুসলমানদিগেরও অনেক কার্য্য পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল কার্য্যের মধ্যে ইষ্টক গ্রথিত দীর্ঘিকাই প্রধান। তাহা পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩০০ ফুট দীর্ঘ, উত্তর দক্ষিণে ২০০ ফুট প্রশস্ত এতদ্দ্বারাই বুঝাযায় যে এই দীর্ঘিকা মুসলমান নির্ম্মিত। দীর্ঘিকার চতুর্দ্দিকে চাতাল বা মঞ্চ; এবং উহা ইষ্টক প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রত্যেক পার্শ্বের চাতাল হইতে ভূপৃষ্ঠে নামিতে এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে জলে নামিবার সুন্দর সোপান শ্রেণী ছিল। তথাকার অধিবাসীরা বলে, বিহারের কোন রাজার কার্য্য কারকেরা এই দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা কোন মতেই সঙ্গত বোধ হয় না, কারণ দীর্ঘিকার নিকটে মুরিশ প্রণালীর কতক অট্টালিকা ছিল এবং নিকটেই মুসলমান সেনাপতির প্রিয়তমা লালবাইর বাসগৃহ। যে কোন ব্যক্তি দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করুক না কেন, তাহার সাজ সজ্জা রাজবাটী হইতে আনা হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ দীর্ঘিকা হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ খোদিত প্রস্তরে পরম্পরায় বিরচিত ছিল।

এই প্রস্তর সম্বন্ধে দুইটী কিম্বদন্তী আছে।

১। এক সম্প্রদায় বলেন, রাজা নীলাম্বর বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করণোদ্দেশে এই সকল জিনিস সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। এই সময়েই মুসলমানেরা তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিল।

২। অপর সম্প্রদায় বলেন, মুসলমানেরা রাজবাটী হইতে, অন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ জন্য, এই সকল প্রস্তর আনিয়াছিল। কেবল মুসলমানেরা যে, সমুদয় ধ্বংস করিয়াছে এমত নহে কোচবিহারের রাজগণও সময় সময় অনেক প্রস্তর আনয়ন করিয়াছেন।

১৮০৯ খৃঃ অব্দে কেল্লার বহির্দ্দিকে এক প্রশস্ত স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়। ইহা কোচবিহার আনার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু গাড়ী ও স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সেই যত্ন নিষ্ফল হইল। কথিত আছে উহা ২২ হাত উচ্চ ২½ হাত পরিধি বিশিষ্ট ছিল।

কথিত দুই রাস্তা ভিন্ন রাজধানী হইতে দ্বারপর্য্যন্ত অনেক গুলি রাস্তা ছিল। তাহার পার্শ্বে কোনও অট্টালিকার চিহ্ন দেখা যায়না। বড় রাস্তার নিকট প্রায় ¼ মাইল রাজবাটীর পূর্ব্বদিকে আর একটী অট্টালিকা ছিল; প্রবাদ আছে এইটী ধনাগার। প্রবাদ আছে মুসলমানেরা গৃহাধিষ্ঠাত্রী কান্তেশ্বরীর বিগ্রহ নষ্ট করিতে সমর্থ হইয়া ছিলনা। মুসলমানদিগের ভয়ে স্বয়ং বিগ্রহ দেবী পুষ্করিণীতে লুক্কায়িত থাকেন এ স্থানেই সিংমারী নদী নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্ব সময়ে এক মৎস্যজীবী তথায় জাল নিক্ষেপ করে কিন্তু উত্তোলন করিতে সমর্থ হয় না, পরে তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে দেবী তাহার জালে বদ্ধ হইয়াছেন। মহারাজ হস্তী ও লোকদ্বারা সেই বিগ্রহ উত্তোলন করেন। হস্তী বিগ্রহ মস্তকে করিয়া গোসানিমারী নামক স্থানে উপস্থিত হইল। তথায়ই সেই জল-নিমজ্জিতা কান্তেশ্বরীর বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠিত হয়; (১৬৬৫ খৃঃ)। ঐ রাজধানী হইতে প্রস্তর ও ইষ্টক আনিয়া বিগ্রহ মন্দির প্রস্তুত হয়। ইহা ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রত্যেক কোণে এক একটী অষ্ট কোণ স্তম্ভ আছে, সেই স্থানেই বিহিত বিধানে অর্চ্চনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উক্ত স্থানের দেবল ব্রাহ্মণদিগকে অদ্যাপি ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হয়।

মুসলমান আক্রমণকারীদের শিবিরের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয় ইহাকে বারঘর বলে; কারণ লোকে বলে যে, নগরাবরোধের সময় ১২ খানা অট্টালিকাতে মুসলমান সেনাপতিগণ বাস করিতেন। যে স্থানে সিংমারী নদী নগর পরিত্যাগ করিয়াছে সেইস্থান হইতেই আক্রমণ আরম্ভ হয়। শিবির মৃণ্ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। শিবির হইতে নগর পর্য্যন্ত স্থানকে সোয়ারিগঞ্জ বলে। বোধ হয় মুসলমান অশ্বারোহিগণ কাওয়াত করিত বলিয়া এরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে।

বিশ্বসিংহের সময়।

মহারাজ বিশ্বসিংহ এই কোচবিহারে রাজত্ব স্থাপন করেন এবং তদীয় বংশধরেরাই রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান ভূপতি তাঁহারই বংশধর। ডাক্তর বুকানন সাহেব এই রাজ বংশের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ উল্লেখ করিয়াছেন। "কান্তেশ্বরের বিলোপের পর এরাজ্য অনেক দিবস পর্য্যন্ত অরাজক ছিল। পরে হাজোনামক এক ব্যক্তি বর্ত্তমান কামরূপের অনতি দূরে এক রাজত্ব

স্থাপন করেন। অদ্যাপি কামাখ্যার মন্দিরের নিকট হাজোর মন্দির নামে একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। তথায় কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে। হাজো, কোচজাতীয় একজন প্রধান লোক ছিলেন। তিনি কোচ ও মেচজাতির একতা সম্পাদন মানসে মেচজাতীয় হাড়িয়া নামক কোন দলপতির সহিত স্বীয় কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দেন, হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহ এবং জীরার গর্ভে শিশু সিংহের জন্ম হয়। বিশ্বসিংহ স্বকীয় বাহুবলে সমুদয় কামরূপ জয় করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করেন। এবং শিশু সিংহকে রায়কত অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব পদ প্রদান করিয়া, বৈকুণ্ঠ পুরের (জলপাই গুড়ীর) রাজত্ব প্রদান করেন। বিশ্ব-সিংহ পর্ব্বত প্রান্ত হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া হিঙ্গলা বাসে স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে তিনিই আসাম প্রদেশের "গোহাম কামাল আলি" নামক বাঁধ বাঁধিয়া ছিলেন।"

১২৮০ সালের গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকাতে উল্লিখিত আছে "ভোটানের অন্তর্গত চিকনা নামে এক পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতে হাড়িয়া মেচ নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার হীরা ও জীরা নামে দুই পত্নী ছিল। জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন এবং রূপমুগ্ধ ধূর্জ্জটীর ঔরসে, হীরার গর্ভে, বিশ্ব ও শিষ্য সিংহ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্ব সিংহ যদিচ আদি রাজা নহেন, তথাপি তাঁহার নামানুসারে, কোচবিহারের অধিপতি দিগকে বিশ্ব-বংশীয় ও তিনি শিব ঔরস সম্ভূত বলিয়া তাঁহার বংশধর দিগকে শিববংশ বলিয়া থাকে।"

এতদ্দেশে প্রবাদ এই যে, যোগিনী তন্ত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, চিক্না পর্ব্বত বাসী কোন ব্যক্তির দুইটী কন্যা জন্মে; একের নাম হীরা এবং অপরের নাম জীরা। হাড়িয়া মেচের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয়। জীরার গর্ভে চন্দন ও মদন জন্ম গ্রহণ করেন। হাড়িয়া হীরার গৃহে উপস্থিত হইলেই ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইতেন, এজন্য হীরা বন্ধ্যা হন। অবশেষে মনকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি ভগবান্ আশুতোষের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। ভবানী পতি তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া যোগী বেশে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তদীয় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাতে আসক্ত ও উপগত হন এবং তদীয় ঔরসে বিশ্ব ও শিশু নামক দুই ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করেন।

মহাদেব স্বকীয় সন্তানকে রাজত্ব প্রদান করিয়া তাঁহাকে হনুমান দণ্ড সমর্পণ করেন। হনুমান দণ্ড অদ্যাপি কোচবিহারের রাজবাটীতে সাদরে রক্ষিত হইতেছে এবং পর্ব্বাদি উপলক্ষে ইহার পূজা হইয়া থাকে।

চিক্না পর্ব্বতস্থ আট গ্রামের অধিপতি টার্ক কোতোয়াল নামে এক ব্যক্তি বিলক্ষণ পরাক্রান্ত ছিলেন। বিশ্ব সিংহের প্রাদুর্ভাবের পর তাঁহার সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। সেই বিবাদে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মদনের মৃত্যু হইলে বিশ্বসিংহ শোকাতুরা বিমাতার সন্তোষার্থে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ না করিয়া কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চন্দনকে রাজ্যভার প্রদান করেন ১৫০৯ খৃঃ অব্দে। চন্দনের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই রাজশকার সৃষ্টি হয়। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে চন্দনের মৃত্যু হয়। পরে বিশ্বসিংহ স্বয়ং

রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমী ছিলেন। তিনি সমুদয় কামরূপ অধিকার করেন। তাঁহার বাহুবলে ভীত হইয়া, ভোটান রাজও কর প্রদানে সম্মত হন। তিনিই চিক্না পর্ব্বত হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া হিঙ্গলাবাসে স্থাপন করেন। কথিত আছে তিনি বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করেন; তাঁহার নিয়মিত মৃত্যু হয় না।

PART III.

AUTHENTIC PERIOD.

তৃতীয় খণ্ড।

প্রমাণসিদ্ধ সময়

প্রথম অধ্যায়।

রাজা বিশ্বসিংহ পরলোক গমন করিলে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইহাঁর সময়ে এরাজ্য বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একদিকে রঙ্গপুর দিনাজপুরের অধিকাংশ স্থান, অপরদিকে নিম্ন আসামস্থ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (গৌহাটী) ও গৌড়নগরের কিয়দংশও এরাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এবং গঙ্গানদীর তীর রাজ্যের শেষ সীমা অবধারিত হইয়াছিল। মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। লোকে তাঁহাকে চিলারায় বলিত। তাঁহার বলবিক্রম প্রভাবেই মহারাজ স্বকীয় রাজ্য এতদূর বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিহার হইতে প্রায় ১৪ মাইল পূর্ব্বদিকে রাণীরহাটের নিকট একটী পুরাতন বাটীর ভগ্নাবশেষ পতিত আছে, তাহা চিলারায়ের বাটী বলিয়া বিখ্যাত। মহারাজ নিজেও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে মল্লনারায়ণ বলিত।

এই মহারাজের সময়েই নারায়ণী টাকার সৃষ্টি ও প্রচলন আরম্ভ হয়। টাকার একদিকে দেবনাগর অক্ষরে মহাদেবের নাম অপরদিকে মহারাজ নরনারায়ণের নাম অঙ্কিত হয়। এই টাকা সেই সময়েই কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলে প্রচলিত হইয়াছিল।

বিখ্যাতনামা কালাপাহাড় কামাখ্যার দেবমন্দির ভগ্নপ্রায় করিয়াছিল। মহারাজ নরনারায়ণ কামাখ্যার মন্দির পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া বিবিধ রত্নভূষণে সুসজ্জিত

করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ সেবাইতদিগকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন এবং দৈনিক পূজার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম প্রচার করেন। অদ্যাপি সেই সকল নিয়ম তথায় প্রচলিত আছে। কামাখ্যার মন্দিরে ইহাঁর ও ইহাঁর কনিষ্ঠ চিলা-রায়ের প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যাত্রীরা ভক্তিবশতঃ তাহার গলে পুষ্পমালা প্রদান করিয়া থাকে। কামাখ্যার মন্দিরে খোদিত নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী দেখা যায়।

১। লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পার্থোধনুর্ব্বিদ্যয়া।
দানেনাপি দধীচি কর্ণসদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ ॥
নানাশাস্ত্র বিচারচারুচরিতঃ কন্দর্প রূপোজ্জ্বলঃ।
কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবনৃপঃ ॥

২। তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্র মৌলিস্থলী।
মাণিক্যং ভজমান কল্পবিটপী নীলাচলে মঞ্জুলং ॥
প্রাসাদং মুনিনাগ বেদশশভৃচ্ছাকে শিলারাজিভি।
র্দ্দেবী ভক্তিমতাং বরো রচিতবান্ শ্রীপূর্ব্বশুক্লধ্বজঃ ॥

এই রাজত্ব সময়েই শারদীয় দুর্গাপূজা প্রথম আরম্ভ হয়। এই পূজা অন্যান্য দেশের পূজার ন্যায় নহে। দুর্গার প্রতিমাতে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী ইত্যা-দির প্রতিমূর্ত্তি নাই, কেবল অসুর, সিংহ এবং একটী ব্যাঘ্রসহ ভগবতী বিরাজিতা থাকেন। সপ্তমী ও নবমীতে পূজার বিশেষ সমারোহ নাই। অষ্টমীতে আট প্রহরে আটবার পূজা হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমীতে পূজাগৃহের স্তম্ভ প্রোথিত করা হয়, প্রত্যেক বৎসর নূতন ঘর নির্ম্মিত হয়। প্রবাদ আছে, এইরূপ পূজা করিবার

জন্য মহারাজ নরনারায়ণের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐরূপ পূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে নরবলি প্রচলিত ছিল। এখনও বহুবিধ বলি হইয়া থাকে।

এই রাজত্ব সময়ে পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, মহারাজার আদেশানুসারে সাধারণের সুখবোধার্থ, রত্নমালা নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন ও প্রচলন করেন। গ্রন্থের শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে।

শগণগ্রহমনুশাকে নাকেন্দ্রাচার্য্যবাসরে শরদি।
অধি পৌর্ণমাসি পূর্ণাসমপদ্যত বিদ্যেয়ং॥

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাণিনি ও কলাপ ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না উক্ত ব্যাকরণ-দ্বয়ের অধিকাংশ সূত্রের সহিত রত্নমালার অনেকাংশ সূত্র অভিন্ন ও অনুরূপ। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ জটিল বিধায়, বোধ হয় তিনি ঐ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই। বস্তুগত্যা রত্নমালা যে এক উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ তাহা পাঠক এবং বিবেচকমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। ইহার রচনা প্রণালী এমনই সরল যে, একটু মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই অল্প সংস্কৃতজ্ঞদিগেরও ঝটিতি অর্থবোধ এবং সহজে মুখস্থ হইয়া থাকে। এই ব্যাকরণের জয়-কৃষ্ণ ও সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি অনেক টীকা আছে, তন্মধ্যে এই দুইটী টীকাই সমধিক মার্জ্জিত ও মনোহর। উক্ত টীকা-কারক মহোদয়দ্বয় অসাধারণ বৈয়াকরণিক ছিলেন। তাঁহাদের টীকা দৃষ্টেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ব্যাকরণে তাঁহাদের কীদৃশ ব্যুৎপত্তি ছিল। শ্রীবীরেশ্বর শর্ম্মা

নামক কোন ব্যাকরণাভিজ্ঞ পণ্ডিত, উক্ত সর্ব্বানন্দ কৃত টীকার দোষ প্রদর্শনকরতঃ তাঁহাকে এবং তদানুষঙ্গিক রত্নমালাকারককে অন্যায় রূপে ভ্রান্ত বলিয়াছেন বটে; কিন্তু বীরেশ্বরের দোষ প্রদর্শন যুক্তি সঙ্গত হয় নাই, তিনি অন্যায়রূপে গ্রন্থকারকে আক্রমণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রত্নমালা ব্যাকরণ এদেশের গৌরবস্থানীয়। ইহা চিরকাল এদেশের কীর্ত্তিঘোষণা করিবে।

মহারাজ তদীয় রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়া শোণকোষ নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী নবার্জ্জিত ভূভাগ কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায়কে প্রদান করেন। চিলারায়ের পৌত্র পরীক্ষিৎ নারায়ণ ও বলিত নারায়ণের বংশধরেরা সংপ্রতি বিজনী ও দুরঙ্ রাজ্যের উত্তরাধিকারী। ইহাঁরা অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন। পরে আসামের আহম বংশীয় রাজগণের এবং মোগলরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্প্রতি ইংরেজাধিকারে জমীদার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃসিংহ নারায়ণ রাজ্যশাসনে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে কনিষ্ঠ মহারাজ নর নারায়ণ রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন; উত্তরকালে তিনি জ্যেষ্ঠের সন্তানগণকে পাঙ্গার রাজত্ব প্রদান করিয়া যান। তাঁহাদের বংশধরেরা বহুদিবসাবধি তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন, সম্প্রতি উক্ত সম্পত্তি দৌহিত্র সন্তানে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজের অগ্রজা শ্রীশ্রীমতী আনন্দময়ী আই দেবতী পাঙ্গার রাজকুমারকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তিনি অল্পাবয়সেই বিধবা হইয়াছেন। এই

সম্পত্তি সম্প্রতি ইংরেজাধিকার ভুক্ত জেলা রঙ্গপুরের অধীন একটী জমিদারী মাত্র।

মেঃ বুকানন বলেন বিশ্বসিংহ পরলোক গমন করার পূর্ব্বে তদীয় তিন পুত্র মধ্যে স্বরাজ্য ভাগ করিয়া দিয়া যান এবং শোণকোষ নদীর পূর্ব্বদিকের স্থানগুলি চিলারায়কে অর্পণ করেন। যাহাহউক এই সকল রাজ্য পূর্ব্বে যে এক রাজত্ব ভুক্ত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৮ খৃীঃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রীতিমত পিতার সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিলেন। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, এরাজ্যের রাজগণ মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে কোনও রাজার লোকান্তর হইলে তদীয় উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ না করিলে, মৃতরাজার সৎকারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সকল কার্য্যেই রাজার আদেশ সাপেক্ষ, বোধ হয়, এই বিবেচনায়ই এরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। মহারাজ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন না। ইহাঁর সময়েই মোগল সম্রাটের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। মুকুন্দ সার্ব্বভৌম নামে রাজার দ্বারস্থ একজন ব্রাহ্মণ, অসুয়া পরবশ হইয়া দিল্লীতে গমন করে এবং তথায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট এরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা সমুদয় প্রকাশ করে। তাহার মন্ত্রণা বলেই মোগলাধিপতি এদেশ জয় করিবার অভি-

প্রায়ে কতিপয় সৈন্য পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মী নারায়ণ সহজেই পরাভূত হইয়া দিল্লীতে নীত হন এবং সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন।* নারায়ণী টাকা অর্দ্ধাকারে মুদ্রিত করিবেন, রাজবাটী হইতে বাদ্যোদ্যম অর্থাৎ নওবৎ ইত্যাদি উঠাইয়া দিবেন এবং অন্যান্য কতিপয় রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করিবেন, ইত্যাদি বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলে, সম্রাট তাঁহাকে মুক্তি দেন এবং তিনি স্বকীয় রাজ্যে পুনরাগমন করেন। মহারাজ প্রত্যাগমন সময়ে প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বারাণসীতে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পূজা দিয়াছিলেন। ইহাঁর সময় হইতেই নারায়ণী-টাকা অর্দ্ধাকারে প্রথম মুদ্রিত হয়। ডাক্তর বুকানন তদীয় কামরূপের বিবরণে লিখিয়াছেন মুসলমানেরা আকবরের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীঃ কোচ রাজ্য আক্রমণ করিয়া, রাঙ্গামাটী নামকস্থানে অধি-নিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার মতে এই ঘটনা উল্লিখিত সময়ের ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তদীয় অষ্টাদশ পুত্রের জন্য অষ্টাদশ বাটী নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম আঠার কোঠা। আঠার কোঠা নামে এক গ্রাম অদ্যাপি রাজধানীর কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে

* কেহ কেহ বলেন সম্রাটের পক্ষ হইতে রাজা মানসিংহ এরাজ্য জয় করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি রাজাকে পরাস্ত করিয়া তদীয় ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই ঘটনার স্থানীয় কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

রাজবাটীর কোন চিহ্ন নাই, বোধ হয় বর্ত্তমান রাজধানী ঐ আঠার কোঠার এক কোঠা। বর্ত্তমান সময়ে বড় আঠার কোঠাতে একটী দেবালয় মাত্র আছে তাহাকে আঠার কোঠার ধাম বলে। তাহা বহুকালের নির্ম্মিত এরূপ অনুমিত হয়। যে সকল পুরাতন দীর্ঘিকা এবং মৃণ্ময় প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারাই ধামের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ, নাজির অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া স্বকীয় তৃতীয়পুত্র মহীনারায়ণকে নাজির-দেবের পদ প্রদান করেন।

১৬২১ খ্রীঃ মহারাজের মৃত্যু হইলে তদীয়পুত্র বীর-নারায়ণ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। এই রাজত্বের প্রারম্ভেই ভুটীয়ারা নিয়মিত কর প্রদানে ক্ষান্ত হয়। সময়ে সময়ে খেলাত ও যৌতুক মাত্র প্রদান করিতে থাকে। রায়-কতগণ অনুপস্থিত থাকাতে নাজিরদেবই অভিষেক সময়ে ছত্রধারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

মহারাজ বীরনারায়ণ পাঁচবৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তিনি অতিশয় কামাসক্ত ছিলেন এবং অসৎ প্রবৃত্তির ফল ভোগ স্বরূপ অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৬২৭ খ্রীঃ মহারাজ প্রাণনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন এবং সংস্কৃ-

তের বিলক্ষণ আদর করিতেন। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত শিক্ষা এদেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়। ইনি পঞ্চরত্ন সভা নামে একটী সভাস্থাপন করেন। কবিরত্ন ও কবিভূষণ নামে দুই পণ্ডিত সভার প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনিই জল্পেশ্বর, গোসানিমারী, সিদ্ধেশ্বরী এবং বাণেশ্বর নামক স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত দেবালয় সংস্থাপন করেন, এই সকল দেবালয় অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান আছে এবং রাজব্যয়ে তথাকার পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। গোসানিমারীর দেবমন্দিরে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী লিখিত আছে।

সম্যত্যা দ্বিষদেক জিত্বরভুজা দণ্ডপ্রতাপার্য্যম।
ক্রীড়াকন্দুক বেগ বর্দ্ধিত যশঃ শ্রীপ্রাণভূমিপতেঃ॥
শাকাব্দে নগ নাগ মার্গণ সিত জ্যোতির্ম্মিতে নির্ম্মিতঃ।
শ্রীভাজা কবি মণ্ডলেন ভবতা ভব্যোভবানী মঠঃ॥

মহারাজ বৎসরের নয়মাসকাল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন এবং অবশিষ্ট তিনমাস আমোদ আহ্লাদে কর্ত্তন করিতেন। ১৬৬৫ খৃঃ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, সর্ব্বত্র এরূপ জনরব প্রচারিত হয় যে মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে; তচ্ছ্রবণে নাজিরদেব মহীনারায়ণ তদীয় পুত্র চতুষ্টয়ের সহিত সসৈন্যে রাজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই কবিরত্ন ও কবিভুষণের প্রাণদণ্ড করেন। নাজিরদেব মনে করিয়াছিলেন ইহাঁরাই স্বীয় অভিসন্ধি সাধন মানসে, রাজার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত করিতে সময় ও সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে। পরে যখন শুনিতে পাইলেন যে রাজার মৃত্যু হয় নাই, তখন তিনি অত্যন্ত

বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তৃতীয় দিবসে মহারাজের মৃত্যু হইলে নাজির দেবের প্রত্যেক পুত্রই রাজা হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নাজিরদেব মৃত রাজার পুত্র মোদনারায়ণকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া নিজেই ছত্রধারণ করিলেন এবং স্বকীয় অনুচর বর্গকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সৈন্য ও পুত্রগণসহ বাটীতে চলিয়া গেলেন।

মহারাজ মোদনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াই বিশেষ বিপদাপন্ন হইলেন। তাঁহার সমুদয় কর্ম্মচারীই নাজির দেবের আত্মীয় লোক, কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেনা। কতিপয় বৎসর অতীত হইলে তিনি ক্রমে ক্রমে সৈন্য-দিগকে আত্মবশে আনিলেন এবং রাজধানীতে যে সকল সৈন্যছিল, তাহাদিগকে সহায় করিয়া নূতন কর্ম্ম-চারীদিগকে অনায়াসে দূর করিলেন; কয়েকজন বিনষ্টও হইল। নাজিরদেব এ সংবাদ শ্রবণে অতি মাত্র ক্রোধা-ন্বিত হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এই যুদ্ধেই নিহত হইলেন। অন্যান্য পুত্রগণ ভোটানে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন এবং তিনি নিজে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করতঃ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই নাজির দেবকে গোঁসাই মহীনারায়ণ বলে। অনেক স্থান পরিভ্রমণের পর নাজিরদেব বৈকুণ্ঠপুরে ধৃত হইলেন এবং তথায়ই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ ভুটীয়াদিগের সহায়তাবলে মহারাজের সহিত দুই তিনবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে

কিন্তু প্রত্যেকবারেই পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। মহারাজ পারিবারিক বিশৃঙ্খলা বশতঃ শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ বিধান করিতে পারেন নাই; তিনি পঞ্চদশ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া নিঃসন্তান পরলোক প্রাপ্ত হন এবং এই হইতে মহারাজ বিশ্বসিংহের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমিক রাজত্বের শেষ হয়।

ন লবীপ্রমকারান্তে বিশোর্ব্বংশ বিনশ্যতি।
অতঃ পরং মহেশানি কুপুত্রঃ পালয়েন্মহীং॥

নরনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, বীরনারায়ণ, প্রাণনারায়ণ, মোদনারায়ণ, ইহাঁরা ক্রমে পিতার রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতঃপর যিনি রাজা হইবেন তাঁহার পিতৃ রাজ্য নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহারাজ মোদনারায়ণের মৃত্যুর পরক্ষণেই নাজির দেবের পুত্রগণ ভোটান রাজের সহায়তা বলে রাজধানী আক্রমণ করিয়া বিশেষ উৎপাত আরম্ভ করেন। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত যজ্ঞদেব এবং ভুজদেব এতচ্ছ্রবণে কতিপয় সৈন্য সহকারে এস্থানে আগমন করিয়া নাজিরদেবের পুত্রদিগকে দূর করিয়া দেন। এবং মহারাজ প্রাণনারায়ণের তৃতীয় পুত্র বসুদেব নারায়ণকে অভিষিক্ত করিয়া যান।

মহারাজ বসুদেবনারায়ণ অধিককাল রাজ্য ভোগে সমর্থ হইলেন না। রায়কতগণ চলিয়াগেলেই নাজিরদেবের বংশধরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং অনায়াসেই

তাঁহাকে নিহত করিতে সমর্থ হয়। নাজিরদেবের সন্তানগণ সকলেই রাজ্য প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন; এমত কালে রায়কতগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বসুদেবনারায়ণের ভ্রাতার পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

পঞ্চম বৎসর বয়ক্রমকালে মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই সময়েই রাজ্যের দক্ষিণাংশে মোগলদিগের দৌরাত্ম আরম্ভ হয়। পাঙ্গার রাজকুমারেরা ঢাকার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ এবং তৎপুত্র জবরদস্ত খাঁর নিকট বশ্যতা স্বীকার করাতে, মোগলেরা এদেশ আক্রমণ করিতে অভিলাষী হয় এবং বহুল সৈন্য-সহ এরাজ্য আক্রমণ করে। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ, যজ্ঞ-নারায়ণ কুমারকে ছত্র নাজিরের পদে অভিষিক্ত করিয়া সৈন্য সংক্রান্ত যাবতীয় ভার তাহার উপর অর্পণ করেন। যজ্ঞনারায়ণ মোগল আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেননা। মোগলেরা বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ নামক পর-গণাত্রয় অধিকার করে। এদিকে কার্জ্জিরহাট, কাকিনা, টেপা, মন্থনা প্রভৃতি স্থানের শাসন কর্ত্তৃগণ স্বাধীন হইয়া উঠে এবং মুসলমান সুবেদারকে নিয়মিত কর প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া সনন্দ গ্রহণ করে।

সেনাপতি যজ্ঞনারায়ণ নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে মহারাজ মহীনারায়ণের পৌত্র শান্তনারায়ণ কুমা-রকে তৎপদে অভিষিক্ত করেন। একাদশবর্ষ রাজত্বের পর মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়।

১৬৯৪ খ্রীঃ মহারাজ রূপনারায়ণ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি মৃত রাজার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত ছিলেন না। কেবল মাত্র জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক ছিল। ইনি নাজিরদেব গোঁসাই মহীনারায়ণের পৌত্র। রাজা মহেন্দ্র-নারায়ণের মৃত্যুর পর নাজিরদেব শান্তনারায়ণ রাজা হইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্যগণ ও সাধারণ লোক সমূহ তাহাতে অসম্মত হওয়ায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। তিনি স্বকীয় ভ্রাতা সত্যনারায়ণকে দেওয়ানের পদে স্থাপন করিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হইল, রূপনারায়ণ রাজা হইলেন, শান্তনারায়ণ সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সত্যনারায়ণ মন্ত্রী হইলেন। রাজ্যের আয় সম্বন্ধে এরূপ বন্দোবস্ত হইল যে নাজিরদেব এবং তাঁহার সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ $\frac{৯}{১৬}$ অংশ, দেওয়ানদেব $\frac{১}{১৬}$ অংশ এবং রাজা অবশিষ্ট $\frac{৬}{১৬}$ অংশ রাজস্ব পাইবেন।

জেঙ্কিন্স সাহেব বলেন রূপনারায়ণ নির্ব্বিবাদে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই। বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইলে মোগলেরাই তাঁহাকে রাজ্যে বরণ করে। তিনি আরও বলেন যে রায়কতবংশ অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত ছত্র নাজিরের কাজ করিয়াছিল পরে মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে, রায়কত ভাগীদেব ও যাগদেব কোচবিহার রাজ্য আত্মসাৎ করার চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিন্তু রূপনারায়ণ মোগল সহায়তাতে তাঁহাদের চেষ্টা বিফল করেন। জেঙ্কিন্স সাহেবের মতে রূপনারায়ণের রাজত্বের প্রারম্ভে মোগল-দিগের দৌরাত্ম আরম্ভ হয় এবং বোদা, পাটগ্রাম এবং

পূর্ব্বভাগ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। কিন্তু আমরা এই মতের পোষকতা করিতে পারিনা। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে মোগলেরা রূপ-নারায়ণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার সহায়তা করিয়াছিল। রাজা রূপনারায়ণ ১৬৯৪ খ্রীঃ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর ৬ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহারাজ রূপনারায়ণ হিঙ্গলাবাস হইতে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া বর্ত্তমান স্থানে স্থাপিত করেন। এই রাজধানী পরিবর্ত্তনের দুইটী মাত্র কারণ লক্ষিত হয়। ১ম—বর্ত্তমান স্থানের প্রায় চতুর্দ্দিক নদী পরিবেষ্টিত থাকায় বিপক্ষের আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত। ২য়—ভোটান ও মোগল রাজের তৎসাময়িক অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়ার সুবিধা হইয়াছিল। হিঙ্গলাবাস রাজ্যের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, সুতরাং দক্ষিণাংশে মোগলদিগের দৌরাত্ম নিবারণ করা সুকঠিন হইত; এদিকে ভোটানরাজ নিকটবর্ত্তী বিধায় সর্ব্বদাই রাজধানী আক্রমণের প্রয়াস পাইতেন। বর্ত্তমান রাজধানী হইতে প্রায় ১৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে পুরাতন রাজধানী অবস্থিত ছিল। এখন সেই স্থান ভোটান্ত প্রদেশের অন্তঃবর্ত্তী এবং নিবিড় অরণ্যাদিতে পরিবৃত ও বহুসংখ্যক হিংস্রজন্তুর আবাস ভূমি। উক্ত স্থানের দেড় কি দুই মাইল ব্যবধান থাকি-তেই এত জঙ্গল দৃষ্ট হয় যে তথায় যাওয়া সহজ সাধ্য

নহে। কিন্তু রাজধানী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যে সকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, অতি পূর্ব্বে ঐ স্থান কোনও প্রধান লোকের আবাস স্থান ছিল। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি রাজপথের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; কয়েকটী সরোবরের চিহ্নও দেখা যায়। কিন্তু ইহা কি দীর্ঘিকার ভগ্নাবশেষ কি নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তনের কার্য্য, তাহা নিশ্চয় করা যায় না।

এই সময়ে নাজিরদেবও বলরামপুরে স্বকীয় আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন। মহারাজ রূপনারায়ণ মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি জবরদস্ত খাঁর সহিত সন্ধি করিয়া বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ পরগণাত্রয়, জমিদারী স্বত্ত্বে প্রাপ্ত হন। স্বাধীন রাজা অন্য রাজাকে কর প্রদান করা অপমান জনক বিবেচনায়, মহারাজা নাজিরদেবের নামে পরগণাত্রয় বন্দোবস্ত করিয়া লন, এই স্থানত্রয়ের জন্য যে কর দিতে হইত তাহা নাজিরদেব শান্তনারায়ণের নামেই দেওয়া হইত। ইহা হইতেই নাজিরদেব এবং মহারাজদিগের বিবাদের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। ইহার সম্যক বিবরণ পরে বিবৃত করা যাইবে। পরগণাত্রয় মোগলাধিকারে ছিল বলিয়া এখনও উহা "মোগলান" নামে খ্যাত এবং বর্ত্তমান মহারাজের জমিদারী ভুক্ত।

নাজিরদেব শান্তনারায়ণের মৃত্যু হইলে মহারাজ তদীয় দত্তক পুত্র ললিতনারায়ণকে তৎপদে অভিষিক্ত

করেন। মহারাজ রূপনারায়ণ বর্ত্তমান মদনমোহনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া প্রথমে পূজা আরম্ভ করেন।

১৭১৪ খৃঃ মহারাজের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

ইতিপূর্ব্বে পর্ব্বত সীমা পর্য্যন্তই ভোটান রাজের অধিকৃত ছিল। ভোটান্ত প্রদেশে তাঁহার কোন স্বত্ব ছিলনা। কিন্তু এই রাজত্ব সময়ে ভোটানরাজ ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভোটান্ত প্রদেশ অধিকার করেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ কি নাজিরদেব ভুটীয়াদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ জন্য কিছুই চেষ্টা করেন না।

নাজিরদেব ললিতনারায়ণের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র রুদ্রনারায়ণ তৎপদে অভিষিক্ত হন। তিনি রাজধানীতেই বাস করিতেন। উপরোক্ত ভূপতির লালবাই নামক একজন যুবতী নর্ত্তকী ছিল তাহার নামানুসারেই ‘লাল-বাজার’ নাম হয়।* মহারাজ ধলিয়াবাড়ী নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক বহুকাল তথায় অবস্থান করেন। অদ্যাপি উক্ত গ্রামে রাজবাটীর চিহ্ন কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। ঐ গ্রাম বর্ত্তমান রাজধানীর দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

বহুকাল রাজত্বের পরও মহারাজের কোন সন্তানাদি না হওয়াতে তিনি দেওয়ানদেব সত্যনারায়ণের পুত্র দীন রায়কে দত্তক রাখিয়াছিলেন এবং রাজ্যভার কিয়দংশ

* জয়নাথ মুনসীকৃত রাজোপাখ্যানে উক্ত বিবরণ উল্লিখিত আছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় মুসলমানদিগের কোন প্রিয়তমার নামানুসারে লালবাজার নাম হয়।

তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দীনরায় তাহাতে সম্মত না হইয়া তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে রাজাকে প্রতিশ্রুত করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা অসম্মত হইলে দীনরায় ঢাকার সুবেদার মহম্মদ আলি খাঁর নিকট গমন করিলেন। এবং তাঁহাকে এরাজ্য আক্রমণ করার জন্য উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। মুসলমান সেনাপতি এদেশে প্রেরিত হইল। ঝাড় সিংহেশ্বর নামক স্থানে সাধারণ সংগ্রাম হইল। কিন্তু ভোটান রাজের সহায়তাতে কোচবিহার রাজ মহম্মদ আলির প্রেরিত সেনাপতিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেওয়ানদেব সত্যনারায়ণ, দীনরায়ের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন মনে করিয়া মহারাজ তাহাকে পদচ্যুত করিয়া, খর্গনারায়ণ কুমারকে তৎপদে অভিষিক্ত করেন। অতঃপর সত্যনারায়ণ সেওড়াগুড়ী নামক গ্রামে যাইয়া বাস করেন অদ্যাপি তাহার বংশধরেরা তথায়ই বাস করিতেছেন।

১৭৬৩ খ্রীঃ মহারাজের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রথমা পত্নী, সপত্নীর গর্ভজাত দেবেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইয়া পতির সহমৃতা হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চারিবৎসর বয়ঃক্রম কালে মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণই শাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে

লাগিলেন; ইতি মধ্যে দেওয়ান খর্গনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে ভোটান রাজ স্বকীয় ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ক্ষমতা এতদূর প্রবল হইয়া পড়ে যে, একজন ভোটান প্রতিনিধি কতক সৈন্য সমেত রাজধানীতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাঁহার অসম্মতিতে কোনও গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারিত না। প্রত্যেক বৎসর বাক্সাদ্বারের সুবেদার চেকা খাতাতে আগমন করিত; তথায় রাজা, দেওয়ান ও নাজির সহ গমন করিতেন এবং উপঢৌকন আদান প্রদান করিতেন। ভূটীয়ারা রাজাকে যে সকল বস্তু উপহার দিত তাহার দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ মূল্যের বস্তু রাজাকে দিতে হইত। এই রাজত্ব সময়ে ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে ১২ই আগষ্ট বাঙ্গলার সুবেদারের ক্ষমতা বিধ্বংস হয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গলার শাসন ভার প্রাপ্ত হন। এখন হইতে বোদা প্রভৃতি পরগণার জন্য যে খাজানা দিতে হইত তাহা কোম্পানিকে দিতে হইল। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ দুই বৎসরের অধিককাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। রাজগুরুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামানন্দ গোস্বামীর * ষড়যন্ত্রে, রতিদেব শর্ম্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণ, রাজ বাটীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণস্থিত পদ্ম পুষ্করিণীর পারে, এক তরবারি আঘাতে রাজার মস্তক চ্ছেদন করে; অল্প বয়স্ক রাজা সঙ্গীদিগের

* রামানন্দের পিতাই প্রথমে রাজগুরুর পদ প্রাপ্ত হন

সহিত খেলায় রত ছিলেন। রতিদেব শর্ম্মা পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। রাজবাটী শোকসাগরে নিমগ্ন হইল প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ রাজধানীতে আসিলেন, নাজিরদেবও উপস্থিত হইলেন।

নাজিরদেব স্বকীয় ভ্রাতষ্পুত্রকে রাজত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পাছে লোকে মনে করে যে তাঁহারই চক্রান্ত বলে রাজা বিনষ্ট হইয়াছেন এই আশঙ্কায় দেওয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর অভিমতে দেওয়ান দেবের তৃতীয় পুত্র ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এদিকে ভোটানাধিপতি দেবরাজ, দেবেন্দ্রনারায়ণের হত্যাকাণ্ড অবগত হইয়া, চক্রান্তকারী রামানন্দ গোস্বামীর প্রাণদণ্ড করিলেন এবং তাঁহার একজন প্রতিনিধি রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিনিধির অসম্মতিতে কোনও কাজ হইবার সম্ভাবনা ছিলনা।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াই দেওয়ানদেব রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবরাজের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে পুনরায় নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক রাজার বিদ্বেষভাব বিদূরিত হইল না এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ দেওয়ানের ক্ষমতায় অসূয়া পরবশ হইয়া রাজাকে নানারূপ কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। রাজা প্রথমে সম্মত হইয়াছিলেন না বটে; কিন্তু কুচক্রীর চক্রভেদ করা তাঁহার অসাধ্য হইল। তিনি পরিশেষে দেওয়ান দেবকে প্রাণে নষ্ট করাই সঙ্গত মনে করিলেন এবং এক দিবস রাজবাটীতে আহ্বান করিয়া

স্বহস্তে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন; অতঃপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনারায়ণকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। ভোটান প্রতিনিধি স্বয়ং এই হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রতিবিধান না করিয়া চক্রান্তকারীদিগের নাম অবগত হইয়া দেবরাজ সমীপে গমন করিলেন। দেবরাজ এতচ্ছ্রবণে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিবার মানস করিলেন। তিনি কতকগুলি ভুটীয়া সৈন্য সমেত ২।৩ জন প্রধান লোককে এরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মানুসারে বার্ষিক ভোজ ইত্যাদির ভান করিয়া চেকা খাতাতে রহিল। এবং রাজা ও দেওয়ানকে তথায় উপস্থিত হওয়ার জন্য যত্ন করিতে লাগিল। রাজা অসুস্থতার ভান করিয়া প্রথমতঃ তথায় যাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু তাহারা কোন মতেই ক্ষান্ত হইল না। রাজা, ও দেওয়ানকে তথায় উপস্থিত হইতে হইল। রাজা তথায় উপস্থিত হইলে ভুটীয়ারা দেওয়ান এবং চক্রান্তকারিগণ সহ রাজাকে বন্দীভাবে দেবরাজের সমীপে লইয়া গেল। নাজিরদেব তাঁহার সৈন্যসহ তথায় উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ভুটীয়াগণ রাজধানীতে আগমন করিয়া রাজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল এবং বিহার রক্ষার জন্য কতকগুলি ভূটীয়া সৈন্য সহকারে একজন প্রতিনিধি এস্থানে রাখিয়া গেল। মহারাণী রাজপুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া অন্দর মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন।

রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া দেখিলেন পূর্ব্বের কর্ম্মচারিগণ কেহই লজ্জা বশতঃ কাজ করিতে স্বীকৃত নহে। তিনি হরেশ্বর কার্জ্জিকে খাশ নবিশের (Personal Secretary) কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, রাজার নিকট কন্যা বিবাহ দিলে কন্যার পিতা এবং বংশধরেরা কার্জ্জি উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং রাজবংশের দৌহিত্র সন্তানগণ ঈশর নামে খ্যাত।

এই রাজত্বে প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী কিছুই নাই। ভুটীয়াদিগের পরাক্রম ক্রমেই বলবৎ হইয়া উঠে, তাহাদের প্রতিনিধিই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছিল। রাজা এবং নাজির প্রতিনিধির হস্তে ক্রীড়া পুত্তলি মাত্র ছিলেন। মহারাজ বিবাহের সাত দিবস পরে পরলোক গমন করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ভোটান রাজের সহিত ভয়ানক বিসম্বাদ উপস্থিত হইল। নাজিরদেব স্বকীয় ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী সকলেই ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দেবরাজ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন বন্দীকৃত রাজার পুত্র কখনই রাজা হইতে পারিবেনা। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র বজ্রেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিতে হইবে। দুই পক্ষে

তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। নাজিরদেব মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, রাজা মনোনীত করার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত আছে, কাজেই তিনি মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ভোটান রাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ রাগান্বিত হইলেন। এবং স্বকীয় ভাগীনেয় জিম্পিকে বহুল সৈন্য সহকারে বিহার অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে নাজিরদেব অন্যান্য কর্ম্ম-চারিগণ সহ যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইলেন। ভুটীয়ারা রাজধানী আক্রমণ করিয়া রাজা এবং রাজ মাতাকে ভোটানে লইয়া যাওয়ার প্রয়াস পাইয়াছিল বটে কিন্তু নাজিরদেব অতুল সাহসের সহিত তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন এবং স্বকীয় আবাস বাটী বলরামপুরে পাঠাইয়া দিলেন। তথায়ও রাজা এবং রাজমাতা নিরাপদে থাকিতে পারি-বেন না বিবেচনা করিয়া পাঙ্গায় প্রেরণ করিলেন। নাজিরদেব তাঁহার নিজ পরিবারও রাঙ্গামাটীতে পাঠা-ইয়াছিলেন। রাজকীয় অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ নানা স্থানে পলায়ন পর হইলেন। জিম্পি ক্রমে ক্রমে সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া রাজ বাটীতে শিবির সন্নিবেশ করিল এবং তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। স্বকীয় প্রাবল্য প্রদর্শনার্থ বজ্রেন্দ্রনারায়ণ কুমারকে রাজাসনে স্থাপন করিল। প্রায় সমুদয় রাজ্য তাহার অধিকৃত হইয়াছিল। রহিমগঞ্জ পরগণা অধিকার করিতে পারিলনা। রূপান সিংহ জমাদার অতি সাহসের সহিত তাহা রক্ষা করিয়া-ছিল। সে স্থানে যাহা আয় হইত তদ্দ্বারা সৈন্যের

খরচ বাদে অতি কষ্টে রাজা ও রাজ মাতার খরচ চলিতে লাগিল। জিম্পি কেবল রাজধানী অধিকার এবং তথায় দুর্গ সংস্থাপন পূর্ব্বক বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, পরিণাম বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত নানাস্থানে সেনানিবেশ স্থাপন করিল। গীতলদহ, মোওয়ামারী ও বালাডাঙ্গাতে তাহার কতক সৈন্য গড়খাই করিয়া অবস্থিত ছিল। জিম্পির সৈন্য মধ্যে কতকগুলি ভোটানের উত্তর প্রান্ত-বাসী লোক ছিল। তাহারা সর্ব্বদাই মাদক সেবন করিত এবং মাংস ভোজন করিত। প্রবাদ আছে অন্য মাংসের অভাব হইলে এস্থানের লোক ধরিয়া নরমাংস আহার করিত। ভুটীয়ারা বিহার অধিকার করিলে, নাজিরদেব গোঁসাই এবং খাশনবিশ অনন্যোপায় হইয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সহায়তা প্রার্থনা করিলেন এবং রাজ্যোদ্ধারের পারিতোষিক স্বরূপ কোম্পানিকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তখন গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। তিনি বলিলেন, কোম্পানি নির্দ্দিষ্ট টাকা বিনিময়ে পরিশ্রম বিক্রয় করেন না। মহারাজ বার্ষিক কর প্রদান করিলে রাজ্যোদ্ধার করিয়া দিতে পারেন। নাজিরদেব অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। উভয়পক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

নিকটবর্ত্তী স্বাধীন রাজগণ একত্রে যোগ করিয়া রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করার মানসে তাঁহার রাজ্যে উৎপাত করিতেছে এবং তজ্জন্য তাঁহার রাজ্যের যথেষ্ট দুরবস্থা

হইয়াছে, এই বিষয় কোচবিহাররাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতার মান্যতম অধ্যক্ষ ও সভাসদের নিকট জ্ঞাপন করাতে মান্যতম অধ্যক্ষ এবং সভাসদ ন্যায়ে অনুরাগ এবং অসহায়ের উপকারেচ্ছাবশতঃ, চারি দল সিপাহী সৈন্য ও একটী কামান, রাজা এবং তদীয় রাজ্য শত্রুপক্ষ হইতে উদ্ধার করার জন্য তথায় পাঠাইতে সম্মত হইলেন, উভয় পক্ষে নিম্নলিখিত রূপ সন্ধি হইল।

১। যে সকল সৈন্য কোচবিহারের সহায়তার জন্য আসিবে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মহারাজকে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা রঙ্গপুরের কালেক্টরের নিকট এখনই আমানত করিতে হইবে।

২। এই টাকায় ব্যয় নির্ব্বাহ না হইলে যত অধিক লাগিবে, তাহা রাজারই দিতে হইবে; সমুদয় টাকা ব্যয় না হইলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তিনি ফেরত পাইবেন।

৩। শত্রুপক্ষ হইতে উদ্ধার হইলে রাজা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিবেন এবং তাঁহার রাজ্য বাঙ্গলা বিভাগের এক প্রদেশরূপে পরিগণিত হইবে।

৪। মহারাজ প্রতিবৎসর কোম্পানিকে তাঁহার রাজস্বের অর্দ্ধাংশ দিবেন।

৫। অপরার্দ্ধ তাঁহার এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের জন্য থাকিবে। তাঁহারা কোম্পানির বাধ্য থাকিলে তাহা চিরকাল উপভোগ করিতে পারিবেন।

৬। প্রকৃত রাজস্ব ঠিক করিবার জন্য মান্যতম অধ্যক্ষ ও সভাসদ তৎপক্ষে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া প্রেরণ করেন, তাঁহার হস্তেই রাজা হস্তবুদ অর্থাৎ

রাজস্ব সম্বন্ধীয় কাগজপত্র দিবেন এবং তদ্দ্বারাই রাজা কত মালগুজারী দিবেন তাহা ধার্য্য হইবে।

৭। কোম্পানির প্রেরিত যে কোন ব্যক্তি মালগুজারী নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহাই চিরস্থায়ী থাকিবে।

৮। আবশ্যক হইলে কোম্পানি তাঁহাকে সৈন্য দ্বারা সহায়তা করিবেন কিন্তু সৈন্যের ব্যয় ভার রাজাকেই বহন করিতে হইবে।

৯। এই সন্ধি দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় কোর্ট অব্ ডিরেক্টর সন্ধি মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা পত্র, মান্যতম অধ্যক্ষ এবং সভাসদকে প্রদান না করেন তৎ সময় পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৭৭৩ সনের ৫ই এপ্রিল তারিখে ফোর্ট উইলিয়মে এক পক্ষে মান্যতম অধ্যক্ষ ও সভাসদের স্বাক্ষর অপর পক্ষে ৬ই মাঘ ১১৭৯ সন ধরেন্দ্রনারায়ণ নাবালক রাজার পক্ষে নাজিরদেব খগেন্দ্রনারায়ণের স্বাক্ষর। নবম ধারার লিখিত মঞ্জুরী কার্য্য প্রকৃত পক্ষে সংঘটিত হয় নাই। এই সন্ধি সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা আমাদের বক্তব্য আছে, তাহা যথা স্থানে বিবৃত করা যাইবে।

সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইলে সৈন্যাধ্যক্ষ জোন্‌স্ সাহেব চারি দল সিপাহী সৈন্য এবং একটী কামান সহ এরাজ্যে আগমন করিয়া ভুটীয়াদিগকে দূরীকৃত করেন। তিনি তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে একেবারে পর্ব্বতে তাড়াইয়া দেন এবং তাহাদের ডালিং-কোর্টের দুর্গ অধিকার করেন। ভূটীয়ারা এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল যে, তিব্বতের তিস্সুলামার পরামর্শে তাহারা সন্ধি

করিতে সম্মত হয়, সেই সন্ধিতে ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ কারামুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ডাক্তার বুকানন বলেন, ভোটান রাজের সহিত সীমা নিরূপণ বিষয়ে যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কারণ ভূটীয়াদিগের সহিত বন্ধুভাব থাকিলে বাণিজ্য সম্বন্ধে বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, বত্রিশ হাজারীর যে অংশ ভোটানের অধিকৃত হইয়াছিল না, তাহাতে রায়কত দর্পদেব স্বত্ববান হয়। তাঁহার মতে বিহার আক্রমণে দর্পদেব একজন সহায়কারী ছিলেন। বাস্তবিক আমরাও বুকানন সাহেবের মত সমর্থন করিব। সন্ধিপত্রের প্রথমে লিখিত আছে স্বাধীন রাজগণ, রাজগণ বলিলেই ভোটান রাজ ব্যতীত অন্য কোন রাজা ছিল এরূপ অনুমান করিতে হইবে। এই সন্ধিতে দর্পদেব একজন জমীদাররূপে পরিগণিত হইলেন, কোচবিহারে তাঁহার কোন ক্ষমতা বা অধিকার রহিলনা।

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ কারামুক্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে সকলে তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার মন এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, তিনি কোন মতেই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে সম্মত হইলেন না। রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণই নিয়মিত মতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ কারামুক্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ, নাজিরদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নাজির? কেন তোমরা কোম্পানিকে রাজস্ব প্রদান করিলে? যে

রাজার হস্তী এবং মুদ্রা ঈশ্বর প্রদত্ত, সে অন্যকে কর প্রদান করিলে, তাঁহাকে কি প্রকারে ছত্রধারী রাজা বলা যাইবে? নাজিরদেব বলিলেন মহারাজ! আপনাকে মুক্ত করার জন্যই আমরা কোম্পানিকে কর প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছি; মহারাজ বলিলেন আমার পূর্ব্ব জন্মের কার্য্যের যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছে। যদি বিশ্বসিংহের বংশ লোপ পাইত, যদি অন্য রাজা এদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহাও অনেক ভাল ছিল। আমি স্বাধীন রাজা হইয়া অন্য রাজার বশ্যতা স্বীকার করিব ইহা হইতে আর লজ্জাকর বিষয় কি হইতে পারে?

রঙ্গপুরের কালেক্টরগণই এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের যাহা কিছু করিবার ইচ্ছা হইত এবং রাজপক্ষ হইতে যে বিষয় গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করান আবশ্যক হইত তাহা কালেক্টরগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইত। তাঁহাদের হস্তেই কর আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। কর গ্রাহীরা সাজোয়াল নিযুক্ত করিয়া এরাজ্যের সমুদয় রাজস্ব আদায় করিতেন এবং অর্দ্ধ গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতেন, অপরার্দ্ধ রাজার ট্রেজারিতে জমা করিয়া দিতেন। ১৭৮০ খ্রীঃ কালেক্টর মেঃ পার্লিং সাহেবের প্রতি রাজস্বসম্বন্ধীয় হস্তবুদ প্রস্তুত করার আদেশ হয়। তিনি হস্তবুদ প্রস্তুত করিলে ঐ বৎসরই স্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত হয়; সেই বন্দোবস্তে এরূপ ধার্য্য হয় যে, রাজা বার্ষিক কোম্পানিকে ৬৭৭০০৻৴ কর দিবেন, তাহা কোন কালেও বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। ঐ সময়ে ইহাই প্রায় রাজস্বের অর্দ্ধেক ছিল। বর্ত্তমান সময়ে

যদিচ রাজার রাজস্ব সম্বন্ধীয় আয় প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে তদনুরূপ করই দিতে হয়। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করেন, তাহার অন্যূন বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল; প্রকৃত পক্ষে কর্ণওয়ালিশ কৃত বাঙ্গলার স্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত এই বন্দোবস্তের কোনও সংশ্রব নাই।

ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সন্ধিতে নাজিরদেবের স্বত্ব সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। উল্লেখ না থাকাতে, কোচবিহারের অশুভ সাধনই হইয়াছিল বলিতে হইবে। পরে নাজিরদেব সম্বন্ধে বিশেষ গণ্ডগোল হইয়াছে তাহা যথা স্থানে বিবৃত করা যাইবে। ১৭৮০ খৃঃ মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে মন্ত্রিবর্গের বিশেষ অনুরোধে ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। অনেক দিবস কারাগারে থাকাতে তাঁহার শরীর ও মন এত অসুস্থ হইয়া পড়িয়া ছিল যে, তিনি কেবল নামে মাত্র রাজা হইলেন, রাজকীয় সমুদয় কার্য্যই মহারাণী এবং তদীয় প্রিয় মন্ত্রী সর্ব্বানন্দ গোঁসাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজা হইয়া তিনি একবার গয়া ও কাশীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন; মহারাণী এবং গোঁসাই এই সুযোগ পাইয়া রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবের সহ-যোগে নাজিরদেবের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; যে নাজিরদেব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এরাজ্যের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার মন্ত্রণাবলে ইংরেজ-দিগের সহিত সন্ধি বন্ধ হইয়া এরাজ্য ভোটান রাজের

হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছিল, সেই নাজিরদেব এখন সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিলেন। তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ও সমুদয় মর্য্যাদা লোপ পাইল। অগত্যা দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে আসামে পলায়ন করিতে হইল।

রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজত্বের শেষভাগে উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন ইহা মহারাণী এবং তদীয় প্রিয় মন্ত্রী সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর যত্ন প্রসূত ফল। সকলে তাঁহাকে পাগলা রাজা বলিত। বস্তুতঃ তিনি নিজে কিছুই কাজ করিতেন না, সমুদয় ক্ষমতা রাণী ও সর্ব্বানন্দের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

১৭৮৩ খৃঃ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

রঙ্গপুরের কালেক্টরগণ রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়া এরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে রাজার টাকশাল বদ্ধ করিয়া দিতেন। কারণ এই টাকাদ্বারা বিনিময় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। কোন সময় এরূপ আদেশ প্রচার করিতেন যে, সহস্রের অধিক টাকা মাসিক মুদ্রিত হইতে পারিবে না। আদেশ লঙ্ঘন অপরাধে সময়ে সময়ে রাজকর্ম্মচারিগণকে কারাবাস দণ্ড প্রদান করিতেন। অধিকাংশ কালেক্টরগণই রাণীর পক্ষসমর্থন করিতেন। নাজিরদেব কাজেই ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হইলেন। মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তদীয়

উইল অনুসারে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইলেন এবং তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার মহারাণীর হস্তে সমর্পিত হইল।

ইতিমধ্যে গুডলাড নামক কালেক্টর নাজিরদেবের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। নাজিরদেব আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া কালেক্টরের নিকট বলিলেন যে, মহারাণীর হস্তে রাজ্যের ভার থাকিলে গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত কর প্রাপ্তির বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইবে। নাজিরদেব স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া এক বৎসর কর আদা-য়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং রাজ-মোহর আত্মসাৎ করিলেন। নিজ পুত্রকে যুবরাজ উপাধি প্রদান করিলেন। রাণী এবং তদীয় প্রিয় পাত্রের প্রতি নানা-রূপ উৎপাত আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই সকল গণ্ডগোলের বিষয় অবগত হইয়া রাজা ও রাণীকে রক্ষা করার জন্য কাপ্তান স্মিথ্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। নাজিরদেবের হস্ত হইতে কর আদায়ের ভার উঠাইয়া দিয়া, মৃত রাজার উইল অনুসারে রাণীর হস্তে সমুদয় কার্য্যভার অর্পণ করিলেন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক নৃপতি হরেন্দ্রনারায়ণের উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করিয়া ১৭৮৪ খৃঃ ২৮শে মে তারিখে রঙ্গপুরের কালেক্টর মুর সাহে-বের দ্বারা নিম্নলিখিত ঘোষণা পত্র রাজ্য মধ্যে প্রচারিত করিলেন। গবর্ণর এবং তদীয় সভাসদ দেখিলেন, কোচবিহারের মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ এক উইল দ্বারা তদীয় পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণকে রাজত্বে বরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালপর্য্যন্ত রাজ্যের সম্যক্‌ভার

মহারাণীর হস্তে রাখিয়াছেন, সুতরাং মান্যতম অধ্যক্ষ এবং সভাসদ বিবেচনা করেন যে, রাজা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত, মহারাণীকে মেনেজারের ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতে পারে। এজন্য কোচবিহারবাসীদিগকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা মহারাণীর আদেশ পালন করে।

উপরোক্ত উইলের সত্যতাসম্বন্ধে সকলেই সন্দেহ করিয়াছেন। কর্ণেল হটন বলেন "যখন কমিসনর মার্সার এবং চিবাট সাহেব এরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা তদন্ত করেন, তখন প্রত্যেক সাক্ষীই এরূপ জবানবন্দী দিয়াছিল যে, তাহাদের সাক্ষ্য, শিক্ষিত কথার ন্যায় বোধ হইল। সকলেই বলিয়াছিল যে রাজা তাঁহার মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে এই উইল করিয়া ছিলেন কিন্তু জয়নাথ মুন্সী তদীয় রাজোপাখ্যানে লিখিয়াছেন যে মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উইল হয়। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে সকলে পাগলা রাজা বলিত। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি পাগল হইয়াছিলেন সুতরাং এই উইলের সত্যতা সম্পূর্ণ সন্দেহ জনক"।

মেজর জেঙ্কিন্স বলেন যে, মহারাণী এবং সর্ব্বানন্দ গোঁসাইর চক্রান্তেই রাজা পাগল হইয়াছিলেন সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে মহারাণী গোঁসাইর সহায়তাতে এই উইল বাহির করিয়াছিলেন। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট সবিশেষ তদন্ত না করিয়াই উল্লিখিত ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু এরূপ বন্দোবস্তে কিছুই ফল হইল না, মহারাণী তদীয় প্রিয়পাত্র সর্ব্বানন্দ গোঁসাইর মন্ত্রণায় ক্রমে ক্রমে সকলকে পুনরায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তুলিলেন। নাজির

দেব আসামে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তথায় থাকিয়াই ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। রাণীর রাজত্বে দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। নাজিরদেব, দেওয়ানদেব প্রভৃতি সমুদয় প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাদের স্বকীয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। এরূপ ভয়ানক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া নাজিরদেবের ভ্রাতা ভগবন্তকুমার দেওয়ানদেব এবং অন্যান্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং হঠাৎ এক দিবস রাজবাটী আক্রমণ করিয়া রাজা, রাজমাতা এবং গোঁসাইকে বন্দীভাবে বলরামপুরে প্রেরণ করিলেন। ১৭৮৮ খৃঃ।

এই সময়ে নাজিরদেব বাড়ী ছিলেন না। সৈন্যগণ মহারাণীর দুরবস্থা করিতে ত্রুটী করিয়াছিল না। রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেব এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একদল সিপাহী সৈন্য বলরামপুরে পাঠাইয়া দেন এবং রাজা ও রাজমাতাকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। নাজিরদেবের সৈন্যের সহিত সাধারণ সংগ্রাম হইয়াছিল এবং কতকলোকও নিহত হইয়াছিল। চক্রান্তকারীদিগকে ধৃত করিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ অপেক্ষায় রঙ্গপুরের কারাগারে রাখা হইল।

গবর্ণর জেনেরল লর্ড কর্ণওয়ালিশ পূর্ব্বে এরাজ্যের দুরবস্থার বিষয় বিশেষ অবগত ছিলেন, কারণ উভয়-পক্ষই সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আবেদন পাঠাইতেন। তিনি অধুনাতন গণ্ডগোলের সংবাদ অবগত হইয়া ১৭৮৮ খ্রীঃ ২রা এপ্রিল তারিখে আদেশ প্রচার করি-লেন যে, লরেন্স মার্সার এবং মেঃ চিবাট এরাজ্যের

আভ্যন্তরিক অবস্থা বিষয়ে তদন্ত করিয়া সম্যক রিপোর্ট করেন। তাঁহাদের প্রতি নানাবিষয়ের তদন্তের ভার অর্পণ করা হয়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী প্রধান।

১ম। নাজির দেবের স্বত্ব এবং অধিকার সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় মীমাংসা করা। ২য়। এরাজ্যের শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্যে ইংরেজ ক্ষমতা কতদূর প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহার নিরাকরণ করা।

১৭৮৮ খৃঃ মে মাসে প্রথমে রঙ্গপুরে তদন্তের কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে মোগলহাট এবং কোচবিহারে ২৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত তদন্ত হয়। ১০ই ডিসেম্বর কমিসনরগণ তাঁহাদের রিপোর্ট প্রেরণ করেন।

নাজিরদেবের তিনটী দাবী ছিল। ১। রাজা মনোনীত করার ক্ষমতা। ২। রাজ্যের আয়ের $\frac{১}{১৬}$ অংশ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজে উপভোগ করা। ৩। বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া।

প্রথম দাবী সম্বন্ধে নাজিরদেব বলেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ শান্তনারায়ণ কুমার হইতে এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দাবী সম্বন্ধে কমিসনরগণ কিছুই বলেন নাই। বাস্তবিক এরূপ ক্ষমতা থাকা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়না, তজ্জন্য কমিসনরগণ নাজিরদেবের এই দাবী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তদ্বিষয়ে আর কিছু উল্লেখ করেন নাই।

নাজিরদেবের তৃতীয় দাবীও কমিসনরগণ অগ্রাহ্য করেন। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, বস্তুগত্যা এই সকল পরগণাতে নাজিরদেবের কোন স্বত্ব ছিলনা,

কেবল তাঁহার নামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। রাজা স্বীয় নামে মুসলমান সুবেদারের নিকট কর প্রদান অবমাননা বোধ করিয়া এই তিন পরগণা নাজিরদেবের নামে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্য সময়ে নাজিরদেব স্বকীয় ক্ষমতা ও চতুরতা বলে অনেক সময় ইহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়াছেন, এক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইলেন।

নাজিরদেবের দ্বিতীয় দাবী সম্বন্ধে কমিসনরগণ তাঁহাকে তাঁহার উপাধি এবং পদে বলবৎ রাখেন। এবং বলরামপুরের চতুর্দ্দিকের দুই ক্রোশ পরিমিত স্থানের স্বত্ব তাঁহাকে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন। রাজ্যের ১/১৬ অংশ প্রাপ্তি বিষয়ে কমিসনরগণ মীমাংসা করেন যে, বার্ষিক কর এবং শাসন খরচ বাদে যাহা আয় হইবে তাহার ১/১৬ অংশ তিনি পাইতে পারেন। কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট ভূমির স্বত্ব তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারেনা। কিন্তু অবশেষে এই স্বত্ব মাসিক ৫০০ পাঁচ শত টাকা বৃত্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ১৭৯৮ সনের এপ্রিল মাসে নাজিরদেব এই সকল নিয়মে সম্মত হইতে অস্বীকৃত হন। পরে ১৮১০ খৃঃ অব্দের প্রতিজ্ঞাপত্র অনুসারে এই বিষয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত নাজিরদেবের প্রতিপালন জন্য দেওয়া হইবে এরূপ ধার্য্য হয়। যাহাহউক ইহার পর হইতে নাজিরদেব রাজ্যের শান্তির কোন ব্যাঘাত করেন নাই। ডাক্তার বুকানন বলেন, সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এই তিন পরগণার রাজস্ব নাজিরদেব পাইতেন, কারণ তিনি প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। কিন্তু যখন ব্রিটিশ গবর্ণ-

মেণ্ট রাজার সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন তখন আর রাজার সৈন্য রাখার আবশ্যক হইলনা সুতরাং নাজিরদেবও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট রাজারপক্ষ সমর্থন করিয়া পরগণা ত্রয় জমিদারী স্বত্বে রাজাকে প্রদান করিলেন।

সন্ধিও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহিত রাজ্যের সম্বন্ধ সূচক প্রস্তাবে কমিসনরগণ বলেন ; "আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে এই সন্ধি পরস্পর সুবিধার জন্য দুই স্বাধীন রাজগণের মধ্যে স্থাপিত হইল। দুর্ব্বল পক্ষ সবল পক্ষের নিকট আংশিক অধীনতা স্বীকার করেন বটে কিন্তু তাহার নিয়মাবলীও স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। সন্ধির তৃতীয় নিয়মে প্রকাশিত আছে যে, রাজা সহায়-তার মূল্য স্বরূপ ইংরেজদিগের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবেন এবং তাঁহার রাজ্য বাঙ্গলা বিভাগের সহিত সংযুক্ত হইবে। কিন্তু যখন ইহা বিবেচনা করা যায় যে, রাজার সহিত গবর্ণমেণ্ট অতঃপর কিরূপ সম্বন্ধে সংসৃষ্ট থাকিবেন, তখন দেখা যায় যে, সন্ধির নিয়মা-বলীতে তাহা স্পষ্টতঃ নির্দ্দিষ্ট রূপে প্রকাশিত আছে। প্রথমতঃ রাজা তাঁহার রাজ্যের একাংশের রাজস্ব প্রতি-বৎসর গবর্ণমেণ্টকে দিবেন, তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট ; তাহা বৃদ্ধি পাইতে পারিবেনা। এবং রাজা গবর্ণমেণ্টের বাধ্য থাকিবেন। সুতরাং সন্ধির অভিপ্রায় ন্যায়তঃ বিবেচনা করিতে গেলে, ইহা স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইবে যে,, দুর্ব্বল পক্ষের মতের বিরুদ্ধে বশ্যতা এবং সংযোগ এই দুই শব্দ দ্বারা সুবিধা অনুসন্ধান করা উচিত

নহে। তাঁহার আপন রাজ্যে স্বাধীন স্বত্বের কোনও প্রকার ন্যূনতা হওয়া সন্ধির অভিপ্রেত নহে, যেহেতু দুইটী রাজ চিহ্ন তাঁহার স্পষ্ট বর্ত্তমান আছে। ১। স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করা এবং ২। বিচার ক্ষমতা।"

উপরোক্ত ঘটনাবলী দ্বারা এরূপ প্রতিপন্ন হয় যে সন্ধির অভিপ্রায় নিম্নলিখিতরূপ ছিল। "কোচবিহার ভবিষ্যতে করদ রাজ্যরূপে গণ্য করা যাইবে এবং গবর্ণমেণ্ট তাহার রক্ষার সহায়তা করিবেন তজ্জন্য কোচবিহার রাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং অংশতঃ তাঁহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু রাজ্যশাসন সমন্ধে তাঁহার স্বাধীনতা অক্ষত রহিয়াছে।"

এই সকল বিষয় ১৮১৬ খ্রীঃ গবর্ণর জেনেরল এবং তদীয় সভাসদ মীমাংসা করেন। তাহাতে এরূপ নিষ্পত্তি হয় যে, কোচবিহারের আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রতি গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না।

রাজ্য মধ্যে অসূয়া পরবশ বিভিন্ন পক্ষ বর্ত্তমান থাকাতে এবং কর আদায়ের প্রণালীর সুব্যবস্থা না থাকাতে এবং স্থানীয় মুদ্রার প্রচলন দূষণীয় বোধ হওয়াতে, গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া এরাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ হস্তক্ষেপ সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে হয় নাই। বরং তদ্দ্বারা রাজ্যের অনিষ্টই সংঘটন হইয়াছে।

এই সকল কারণে কমিসনরগণ এরাজ্যে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট রাখার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ১৭৮৯ খ্রীঃ হেনরী ডগ্লাস সাহেব কমিসনর নিযুক্ত হইয়া

আইসেন। তাঁহার আগমনে রাজ্যে একরূপ শান্তি স্থাপিত হয়। কমিসনর বিচার এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় আফিসের কাজ কর্ম্ম নিজেই করিতেন ও নিম্ন আদালতের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেন এবং তথাকার বিচার্য্য কোমদ্দমার আপীল শুনিতেন। তিনি ক্রমে ক্রমে রাণী এবং তদীয় প্রিয় মন্ত্রীর ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার রেবিনিউ বোর্ডে এবং সদরদেওয়ানী আদালতে, তাঁহার ত্রৈমাসিক রিটার্ণ দাখিল করিতেন।

রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত রঙ্গপুরের জিলায় রাজার যে সকল জমিদারী ছিল, তাহার শাসন সংরক্ষণের ভারও কমিসনরের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এমন কি কার্য্য বাহুল্য বিষয়ে তিনি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৯০ খৃঃ এতদ্ব্যতীত অধিকতর কার্য্যভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহাকে গোয়ালপাড়ার রেসিডেণ্টের কাজও করিতে হইত। তিনি ১৭৯০ খৃঃ ভূমি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াও করিতে পারিলেন না। অতঃপর যখন আমুটী সাহেব এরাজ্যের কমিসনর ছিলেন, তখন রাজ্যের ভূমি সম্বন্ধে নিয়মিত বন্দোবস্ত হয়, এবং ঐ সঙ্গে রঙ্গপুরের অন্তর্গত জমিদারীরও পাঁচসনা ম্যাদে এক বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ১৮০১ খৃঃ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে আমুটী সাহেব তাঁহাকে রাজ্যভার অর্পণ করিতে আদিষ্ট হন এবং তিনি চলিয়া যান।

ডগ্লাস্কের সময় হইতে ডগ্লাস, বুস্, স্মিথ্ এবং আমুটী সাহেব রেসিডেণ্ট কমিসনর ছিলেন। তাঁহাদের অনু-

পস্থিতিতে রঙ্গপুরের কালেক্টর লামস্‌ডেন এবং রাইট সাহেব সময়ে সময়ে প্রতিনিধি কমিসনরের কাজ করিতেন। উপরোক্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে এরূপ কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়না যে, তদ্দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট এরাজ্যে কিরূপ আধিপত্য প্রকাশ করিবেন। টাকশাল সম্বন্ধেই কেবল কতিপয় বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৯৫ খৃঃ কমিসনর স্মিথ্ সাহেব রিপোর্ট করেন যে, রাজা পুনরায় মুদ্রা নির্ম্মাণে অভিলাষী এবং গবর্ণমেণ্ট যখন বার বার নিষেধ করিয়াছেন তখন আর তিনি গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় জ্ঞাত করান আবশ্যক বোধ করেন না। ১৭৯৬ খৃঃ বোর্ড অব্ রেবিনিউ কোচবিহারে সিক্কা টাকা প্রচলনের জন্য প্রস্তাব করেন বটে, কিন্তু সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় না; ইহাও দেখা যায় যে ১৭৯৯ খৃঃ টাকশালের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিতেছিল, কারণ ঐ বৎসর কমিসনর আমুটী সাহেব ঐ কার্য্য তিন মাস স্থগিত রাখার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ১৭৯৬ খৃঃ মুদ্রাঙ্কনের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। এবং মুদ্রাযন্ত্র কমিসনরের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল না। রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে কমিসনরগণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া টাকশাল সম্বন্ধে কোনও নিয়ম প্রচার করিতে পারিতেন না।

এই সময়ের আর একটী প্রধান ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। ১৭৯২ খৃঃ ১০ই আগষ্ট লামস্‌ডেন সাহেবের প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে এরূপ

অনুজ্ঞা প্রচারিত হয় যে, রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল পর্য্যন্তই ভূমির বন্দোবস্ত স্থায়ী থাকিবে; রাজা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে এই বন্দোবস্তে তিনি বাধ্য হইবেন না। এই ঘটনাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা এবং শাসন সম্বন্ধীয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী ছিলেন না; এবং প্রকৃত পক্ষে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই।

১৭৯৩ খ্রীঃ হাজারাসিংহ নামক এক ব্যক্তি বিহার আক্রমণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল কিন্তু পাটগ্রামের নিকট একদল সিপাহী সৈন্য তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল।

১৭৯৪ খ্রীঃ মহারাজ, যদুনাথ ঈশর এবং পদ্মনাথ কার্জির কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন, তদুপলক্ষে মহা-সমারোহ হইয়াছিল।

১৮০১ খ্রীঃ কমিসনর চলিয়া গেলে পুলিসের তত্ত্বাবধারণের ভার রঙ্গপুরের কালেক্টরের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। ১৮০৩ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিলেন যে, পুনরায় কমিসনর নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং মেঃ পিরার্ডকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার প্রতি এরূপ অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, তিনি রাজার সহযোগে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কতিপয় সুনিয়ম সংস্থাপন করিবেন, বিচার বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবেন, পুলিস আফিস ভাল করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। পিরার্ডের নিযুক্তি পত্রে ইহাও দেখা যায় যে, রাজার ইচ্ছামত তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যকালে রাজা তাহাতে

অস্বীকৃত হইলেন এবং পিরার্ড কোচবিহার আগমন করিলে, তাঁহার উপস্থিতি বিষয়ে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কাজেই গবর্ণমেণ্ট ১৮০৪ খ্রীঃ ১লা আগষ্ট পিরার্ডকে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

এই বৎসরই ফ্রেঞ্চ সাহেব পুনরায় এরাজ্যের কমিসনর নিযুক্ত হইয়া আইসেন, তাঁহাকে এরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছিল যে, রাজা যাহাতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রীতি অনুসারে আফিস সকল সংস্থাপন করেন এবং নিয়মাদি প্রচার করেন, তদ্বিষয়ে তিনি মত লওয়াইবেন। আফিসে রাজার নিজ কর্ম্মচারিগণই থাকিবে। যত দিন কমিসনর রাজাকে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত করিতে অসমর্থ থাকেন, ততদিন কেবল রাজকীয় বিচার এবং অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করিবেন। এবং কোনও ভয়ানক অবিচার হইলে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন।

ফ্রেঞ্চ সাহেবও রাজার মতপরিবর্ত্তনে সমর্থ হইলেন না; কাজেই ১৮০৫ খৃঃ কোচবিহারের কমিসনরী এবালিস হইয়া পুনরায় রঙ্গপুরের কালেক্টরের হস্তে এরাজ্যসম্বন্ধীয় ভার অর্পিত হইল এবং রাজাকে এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে, গবর্ণমেণ্ট আপন মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, কেবল সংপ্রতি এই সকল বিষয় স্থগিত রাখিলেন। কারণ অভিজ্ঞতাবলে রাজা ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই সকল কার্য্যে সম্মত হইবেন। ১৮০৫ খৃঃ ১৩ই নবেম্বর।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ গবর্ণর জেনেরল থাকা সময়ে রাজাকে শিক্ষিত করার জন্য বিশেষ চেষ্টাচেষ্টা হইয়াছিল। এবং শিক্ষাও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু রাজা স্বাধীনতা

পাইয়াই কুক্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার বুকানন বলেন, রাজা সর্ব্বদা মাদক দ্রব্য সেবন করিতেন এবং অসংসর্গেই দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতেন। রাজকার্য্যের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ দিতেন না। এই সময়ে বাঙ্গালী বাবুরা এরাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। রাজগণেরা অলসতা প্রযুক্ত কাজ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, দক্ষিণ দেশীয় লোকের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয় এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর পদ তাহারাই অধিকার করিয়া লয়।

কোচবিহার কমিসনরী উঠিয়া গেলে, রঙ্গপুরের কালেক্টর মণ্টগোমারী এবং ডিগবী এরাজ্য সম্বন্ধীয় ভারপ্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের সময়ের প্রধান ঘটনা এই: রাজা অসূয়াবশতঃ দেওয়ানদেব ও নাজিরদেব এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলে, ডিগবী সাহেবকে এরূপ আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল যে, তিনি আবশ্যক হইলে রঙ্গপুর হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া নাজিরদেবকে মার্সার ও চিবাটের রিপোর্ট অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকারী রাখেন।

এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের মত স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। ১৮১১ খৃঃ ডিগবী, নীলধন তেওয়ারি নামক এক প্রজার দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন, তাহাতে রাজার অনেক দোষ বর্ণিত ছিল। রাজা পাঁচ ছয় মাসে একবার বাহির হন, তাহাতেও কোন প্রজার সঙ্গে দেখা হয় না, প্রজারা রাজ্য ছাড়িয়া যাইতেছে ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে এরূপ আদেশ প্রচার করেন

যে, রাজার স্বাধীন স্বত্ব বিষয়ে পূর্ব্বে যেরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে এখন আমরা হস্তক্ষেপ করা উচিত বিবেচনা করিনা। ব্যক্তিগত বিচারসম্বন্ধীয় যাবতীয় ভার রাজার হস্তেই থাকিবে।

মেজর জেঙ্কিন্স বলেন, এই নালিশ ব্যক্তিগত ছিলনা, ফৌজদারীকোর্ট, অন্যায়পূর্ব্বক দেওয়ানীআদালতের ডিক্রীজারীর বাধকতা জন্মাইলে, রাজার ফৌজদারী কোর্টের বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত হয়, তথায় রাজার দেওয়ান গুরুপ্রসাদ প্রধান কর্ম্মকারক ছিলেন। ১৮১৪ খৃঃ মেক্লিয়ড সাহেব এই বিষয় গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করাতে, গুরুপ্রসাদকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার আদেশ হইয়াছিল।

ক্রমে নাজিরদেব, দেওয়ানদেব প্রভৃতির প্রতি অত্যাচার না কমিয়া বরং বৃদ্ধিই পাইতেছিল। একদা দেওয়ানদেবের মোক্তার হরিশচক্রবর্ত্তীকে রাজা কারাগারে রুদ্ধ করেন। মণ্টগোমারী কোচবিহার আসিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর মোক্তারকে মুক্ত করিয়া এক দল দেশীয় সৈন্য তাহার রক্ষার্থে রাখিয়া যান। কিন্তু সেই সকল সৈন্য চলিয়া গেলেই, রাজা পুনরায় মোক্তারকে কয়েদ করেন এবং কেহ কেহ বলেন, কয়েক দিবস পরে তাহাকে নিহত করেন। দেওয়ানদেব স্বকীয় জীবনের বিপদাশঙ্কা জ্ঞাত করাইলে, এক দল সৈন্য তাঁহার রক্ষার্থ প্রেরিত হয় এবং ডিগবী সাহেব কোচবিহার আসিয়া এরূপ রিপোর্ট করেন যে, দেওয়ানদেবের প্রতি রাজার এতদূর বিদ্বেষ এবং তিনি এরূপ অশিষ্ট

ব্যবহার করিতেছেন যে, আমার বিবেচনায় উপদেশে কিছুই ফল হইবেনা।

এই অত্যাচারের সংবাদ গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইলে, ১৮১৩ খৃঃ পুনরায় মেক্লিয়ড সাহেব এথাকার কমিসনর নিযুক্ত হইয়া আইসেন। কমিসনরের আগমনে রাজা প্রথমে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে সম্মত আছেন।

কমিসনরকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আফিসসম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালীর সুশৃঙ্খলা করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। পুলিস বিভাগের উন্নতি সাধনার্থ কমিসনরকে রঙ্গপুরস্থ কয়েকটী থানার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাও প্রদান করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনও রূপ পরিবর্ত্তনে তিনি রাজাকে সম্মত করাইতে পারিলেন না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট দ্বারা রাজ্য শাসন চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। ১৮১৬ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাজাও কমিসনরকে এই বিষয় লেখা হইল।

এই সময় হইতে কমিসনরগণ উপদেশ ব্যতীত এরাজ্যের প্রতি কোনও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

১৮২২ খ্রীঃ এরাজ্যে অতিবৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদির পক্ষে বিশেষ হানি হইয়াছিল।

মেক্লিয়ডের পর স্কট্ সাহেব কমিসনর নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকায়, এরাজ্য সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন নাই। তিনি দেওয়ানদেব এবং নাজিরদেব সম্বন্ধীয় কতিপয় আপত্তি

মীমাংসা করেন; এবং রাজার রাজকার্য্যে অমনোযোগিতা এবং অপরিমিতব্যয়িতা দোষে গবর্ণমেণ্টের যাহা বাকী পড়িয়াছিল, তিনি তাহা আদায় করিতে সযত্ন হয়েন। রবার্টসন নামে এক সাহেব ১৮৩০ হইতে ১৮৩৪ খৃঃ পর্য্যন্ত কমিসনর ছিলেন কিন্তু তিনি কখনও কোচবিহারে পদার্পণ করেন নাই। ১৮৩৪ খ্রীঃ মেজর জেঙ্কিন্স এথাকার কমিসনরের পদে নিযুক্ত হয়েন।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভেটাগুড়ী ও ধলুয়াবাড়ীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া অনেক দিন অবস্থিতি করেন। ঐ সকল স্থানে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

১৮৩৫ খ্রীঃ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কাশী যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অনেকস্থলে হিন্দু নিয়ম মতে পূজা অর্চ্চনা ও দানধ্যান করিয়াছিলেন। বারাণসীতে পৌঁছিয়াও বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। মহারাজ কাশীযাত্রার পূর্ব্বেই তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ এবং চতুর্থ পুত্র বজ্রেন্দ্রনারায়ণকে একত্রে রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া যান।

নবম অধ্যায়।

১৮৩৯ খ্রীঃ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কাশীধামে পরলোক গমন করিলে, কুমার বজ্রেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসন পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিবেন্দ্রনারায়ণ ভুপ স্বকীয় বুদ্ধি এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর সহায়তাবলে, সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ অপরিমিত গুণশালী ছিলেন। কোনও ভুপতি তাঁহার মত সুচারুরূপে রাজকার্য্য সমাধা করিতে পারেন নাই। তদীয় পিতা তাঁহাকে ঋণজালে যেরূপ আবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, মহারাজ মিতব্যয়ী এবং সুশৃঙ্খলাস্থাপক না হইলে এরাজ্যের অদৃষ্টে যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা বলা যায় না। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াই রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ বিধান করিতে লাগিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের প্রতি বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন। কাজেই রাজস্বে অধিক আয় হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় মিতব্যয়িতাগুণে এবং গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে, কর বাবদে গবর্ণমেণ্টের যত দেনা ছিল, তাহা সমুদয় পরিশোধ করিয়া, রাজ্যকে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা হইতে মুক্ত করিলেন। তিনি যে কেবল গবর্ণমেণ্টের দেনা পরিশোধ করিলেন এমত নহে, হরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের সাময়িক অন্য প্রকারের বহুতর দেনা ছিল, তিনি তাহাও পরিশোধ করিলেন এবং মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তি সঞ্চিত রাখিয়া গেলেন। বাস্তবিক এই ভুপতিই রাজ্যরক্ষার একমাত্র মূল।

ইনি পাঁচগড়ের বজ্রধরকার্জির কন্যা এবং পর্ব্বত জোয়ারের ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা মহিষী শ্রীশ্রীমতি কামেশ্বরী আই দেবতীকে, শ্রীশ্রীডাঙ্গর আইদেবতী বলে। তিনি এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন। এবং রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় তাঁহার আদেশ ব্যতীত হইতে পারে না। ইহাঁকে

যেরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা এবং বুদ্ধিমতী দেখা যায়, তাহাতে অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই মহারাণীর ক্ষমতা প্রভাবেই মহারাজ কোনও অসদাচরণ করিতে পারেন নাই এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় কোনও দোষে দূষিত হইতে পারেন নাই।

এই রাজত্বে ধর্ম্মশালা নামক একটী অতিথিশালা স্থাপিত হয়। অদ্যাপি তাহার কার্য্য চলিতেছে এবং নিয়মিত অতিথি সেবা হইতেছে। ১৮৪২ খ্রীঃ অতি বৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৪৬ খ্রীঃ মহারাজ কাশীযাত্রা করেন, যাত্রাকালে তিনি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত মহেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যের মেনেজার নিযুক্ত করেন এবং মৃত্যুর পর বজ্রেন্দ্রনারায়ণ (সরবরাকার সাহেব) কে মেনেজার মনোনীত করিয়া যান এবং উক্ত সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

১৮৪৭ খ্রীঃ কাশীধামে মহারাজের মৃত্যু হইলে, মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ যথারীতি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৬ বৎসর ছিল। রাজার প্রার্থনানুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রক্ষারভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণনগর কালেজে ইংরেজী অধ্যয়ন করিতে দেন এবং বজ্রেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যের ও জমিদারীর মেনেজার নিযুক্ত হন।

দশম অধ্যায়।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের উত্তর পূর্ব্বপ্রান্তের এজেণ্ট জেন্‌কিন্স সাহেব ১৮৩৪ খ্রীঃ হইতে এ রাজ্যের কমিসনরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ তিনি এরূপ রিপোর্ট প্রদান করেন যে, তাঁহার সময়ে ১৮৩৬, ১৮৪১, ১৮৪৫, ১৮৪৯ খ্রীঃ চারিবার কোচবিহার পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টের উপসংহারকালে লিখিয়াছেন যে, বিগত ৩৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকীয় সমুদয় কার্য্যভার রাজা এবং তদীয় কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহাতে কমিসনরের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না। ২৬ বৎসরকাল কোনও স্থানীয় কমিসনর ছিলনা এবং-একাদিক্রমে চতুর্দ্দশবৎসর কোনও কমিসনর কোচবিহার পরিদর্শন করেন নাই।

মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ কিয়দ্দিন কৃষ্ণনগরে থাকিয়া কলিকাতা কোর্টঅব্‌ওয়ার্ডসে আনীত হন এবং তথায় রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে রাজ্যের শাসন সম্বন্ধীয় কার্য্য নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইত। মৃত রাজার অনুমত্যনুসারে সর-বরাকার সাহেব মেনেজার নিযুক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর শাসনভার শ্রীশ্রীমতি মহারাণী কামেশ্বরী ও বৃন্দেশ্বরী আই দেবতীর হস্তে ন্যস্ত ছিল।

ফৌজদারী আদালতে একজন আহেলকার, একজম নাএব আহেলকার ও একজন আপীলের জজ ছিলেন। দেওয়ানী আদালতে একজন সদর আমিন, একজন

আহেলকার এবং একজন আপীল জজ ছিলেন। আপীল জজের পদে বজ্রেন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র অধিষ্ঠিত ছিলেন। অপর সকল কর্ম্মচারীই ভিন্ন দেশীয় ছিল। এদেশে বিচারককে আহেলকার বলে। সাধারণ-ব্যবস্থা-প্রথা সমন্বিত প্রদেশ সকলের মাজিষ্ট্রেটের যেরূপ ক্ষমতা আছে, ফৌজদারী আহেলকারেরও তদ্রূপ ক্ষমতা ছিল। তিনি ফৌজদারী আদালত এবং পুলিশের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মেজর জেন্‌কিন্স বলেন, এই আদালতের বিচার এবং ইহার কর্ম্মচারিগণের দক্ষতা অন্যান্য প্রদেশের কর্ম্মচারিগণের দক্ষতা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তিনি আরও বলেন যে, অল্প বেতন পাইলে লোক অসৎপথ অবলম্বন করিতে পারে বটে; কিন্তু এই সকল কর্ম্মচারী অল্প বেতন পাইয়াও সৎপথেই ছিলেন। সকলেরই আয়ের অন্য উপায় ছিল। তিনি ফৌজদারী আদালত পরিদর্শন করিয়া কখনও অসন্তুষ্ট হন নাই। সদর অর্থাৎ কোতোয়ালী, দীনহাটা, মেকলীগঞ্জ, গিলাডাঙ্গা, ভবানীগঞ্জ, শ্যামগঞ্জ এবং চক্রবন্দী নামক ৬টী থানা বা ফাঁড়ি ছিল। পূর্ব্বে থানার কাজ অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়ই হইত। নায়েব আহেলকার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। ফৌজদারী আদালত ও আপীল আদালতের উপর রাজসভা নামে বিচারালয় ছিল, তথায় রাজা স্বয়ং কিম্বা সরবরাকার সাহেব সভাপতি থাকিতেন। দেওয়ান ও মুস্তফী প্রভৃতিরা মেম্বর ছিলেন।

দেওয়ানী আদালতে একজন সদর আমিন এবং একজন আহেলকার ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে যেরূপ মূল্যের ষ্টাম্প দিতে হয়, এখানে ষ্টাম্পের পরিবর্ত্তে তৎপরিমিত মূল্য ফিস্ স্বরূপ দিতে হইত। ঐ ফিস্ দ্বারাই ঐ আফিসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এখানে বিশেষ নিয়ম এই ছিল যে, দরখাস্ত দাখিল করিলেই আসামীকে জামিন দিতে হইত। জামিন দিতে অসমর্থ হইলে তাহাকে কারাগারে রাখিবার নিয়ম ছিল। অনেক দিন হইতেই এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, কারণ অধমর্ণ প্রায়শঃ বিদেশীয় লোক, তাহারা অনায়াসেই ভুটানে কি রঙ্গপুরে পলায়ন করিয়া যাইতে পারিত।

বার্ষিক কর আদায়ের জন্য চারিটী আফিস ছিল এবং তাহাতে চারিজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। উপরোক্ত শাসন প্রণালী বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। উক্ত কর-আদায়-প্রণালীর সুশৃঙ্খলা না থাকায় ১৭৪০ এবং ১৭৯০ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট আবোয়াব, নজর, সেলামি প্রভৃতি যত প্রকারের অন্যবিধ উপায় ছিল, তাহা উঠাইয়া দেন এবং ১৮১৪ খৃঃ এরূপ নিয়ম প্রচার করেন যে, খাস ও খানগি মহালে কোনও প্রভেদ থাকিবে না। কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্তে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব নিয়ম প্রচার করেন এবং পূর্ব্বমত অন্যবিধ কর আদায় হইতে থাকে এবং তাহা উল্লিখিত সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। খাস মহালের কর আদায়ের ভার দেওয়ানের হস্তে ছিল। আজ জমা ব্যতীতও প্রজাদিগকে অনেক প্রকারে অধিক টাকা দিতে হইত।

খাসভূমি ব্যতীত, নূতন আবাদি জঙ্গলা ভূমির (যাহাকে দেওয়ান বস্ বলে) কর আদায়ের ভারও দেওয়ানের হস্তে ছিল। খাসজমী সকল কয়েক বৎসরের ম্যাদে ইজারা দেওয়া হইত। এই সকল খাসমহাল শস্য বিবেচনায় ছয়ভাগে বিভক্ত ছিল। ইক্ষু ও সরিষা ক্ষেত্রের জন্য অধিক কর দিতে হইত। রাণীগণ, রাজার জ্ঞাতিগণ এবং আফিসের কার্য্যকারকগণই সচরাচর ইজারা গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা স্বকীয় চাকর বা আত্মীয়ের নামে পাট্টা লইয়া নিজেরা প্রতিভূ থাকিতেন। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপতি রাজস্ব সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ নিয়ম করেন যে, ইজারাদারগণ শৎকরা তিন টাকা অগ্রিম দিলে, তাহারা প্রত্যেক পঞ্চম বৎসরে ইজারা পুনঃগ্রহণ করিতে পারিবে। ইজারা সকলের মধ্যে অনেকগুলি পৃথক পৃথক জোত ছিল। বস্তুগত্যা ইজারা সকল একজনের হস্তেই থাকিত; এবং জোতদার ও রাইয়তগণ স্থায়ীরূপে পাট্টা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা ভোগ করিত। যদিচ কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক ছিলনা, কিন্তু এই নিয়মে প্রজারা কোনও আপত্তি করে নাই বরং জোতদার দিগকেই আপত্তি উত্থাপন করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু ভাল শস্য উৎপাদনের উৎসাহ কিছুমাত্র প্রদর্শন করা হইত না।

খানগি মহাল অর্থাৎ যে ভূমির উপস্বত্ব দ্বারা রাজ পরিবার প্রতিপালিত হইতেন, তাহার কর আদায়ের ভার, তিনজন কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং তজ্জন্য

তিনটী আফিস ছিল। ইহার প্রধান মহালের কর আদায়ের ভার ফৌজদারী আহেলকারের হস্তে ছিল। তাঁহার সংগৃহীত রাজস্ব, দেওয়ানের সংগৃহীত রাজস্বের অর্দ্ধ পরিমাণ ছিল। অপর এক মহালের নাম খাসবস, তাহা রাজার নিজহস্তে ছিল। অন্যটী বাজেমহাল, দেবত্র ও জায়গীর ইহার অন্তর্গত।

জমিদারী পরগণাত্রয়ের কর আদায়ের ভার মুস্তফীর হস্তে ছিল, তিনি বাজেমহালেরও কর আদায় করিতেন। পরগণা পূর্ব্বভাগ, কোনও ইউরোপীয়কে পত্তনি দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে রাজার বিলক্ষণ লাভ হইত। কিন্তু এতদ্দ্বারা অনেক গুলি কর্ম্মচারীর ক্ষতি এবং প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার হইবার আশঙ্কায়, মুস্তফী পুনরায় তাহা নিজহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ রাজার তিন শ্রেণীর সৈন্য ছিল। পুরাতনদলে ৮১ এবং নূতনদলে ৫৮ জন সৈন্য ছিল। একজন রেসেলদার ও একজন বরকন্দাজের অধীনে ২০০ লোক ছিল। উল্লিখিত সময়ে নাজিরদেবের সৈন্যাধ্যক্ষ পদ ছিলনা।

১৮৫৪ খ্রীঃ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এরাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। রাজকর্ম্মচারিগণ, সেরাজগঞ্জ হইতে ধান্যাদি আনিয়া এখানে খরিদ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। তদ্দ্বারা স্থানীয় লোকের বিশেষ আনুকূল্য হইয়াছিল। এরাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণ জন্য কোনও কৃত্রিম নদী ইত্যাদি খনন করার আবশ্যক করে না, কারণ অনাবৃষ্টি কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি প্রশমনের জন্য কোনও প্রকৃষ্ট উপায় এখানে সংস্থাপিত হইতে পারে

না, কারণ এরাজ্যের সর্ব্বত্রই সমতলভূমি। ১৮৬৩ খ্রীঃ পঙ্গপালও এরাজ্যের শস্যের বিশেষ হানি করিয়াছিল।

১৮৬০ খ্রীঃ মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজ্যভার তদীয় হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি বহুবিধ সৎকার্য্য করিবার প্রয়াস পান বটে, কিন্তু মন্ত্রিবর্গের দুরভিসন্ধিতে সকল মনোরথ হইতে পারেন না। তিনি ১৮৫৯ খ্রীঃ জেন্‌কিন্স স্কুল স্থাপন করেন। পূর্ব্বে ষ্টাম্প প্রচলিত ছিলনা, তিনিই ষ্টাম্প সম্বন্ধীয় নিয়ম এদেশে প্রচার করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে ভুটিয়াদিগের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়। তাহারা কয়েকজন লোককে ধরিয়া নেয়। মহারাজ পুণ্ডিবাড়ী নামক স্থানে কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দেন এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা প্রার্থনা করেন কিন্তু ইতিমধ্যে ভোটানরাজ হইতে বন্ধুতাদ্যোতকপত্র পাওয়াতে আর ইংরেজ সহায়তা আবশ্যক করে না।

রাজত্বের প্রারম্ভে মহারাজ উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন কিন্তু ক্রমেই কুক্রীড়াসক্ত হইয়া উঠিলেন, পূর্ব্বসঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি নাশ করিলেন। তাঁহার অপরিমিত পানদোষ ছিল, অবশেষে সেই দোষেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ ৬ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়; তাঁহার তিন সন্তান: জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রনারায়ণ কুমার, কনিষ্ঠ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, সর্ব্বজ্যেষ্ঠা রাজকুমারী শ্রীশ্রীমতি আনন্দময়ী আই দেবতী।

একাদশ অধ্যায়।

মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে, তদীয় উইল অনুসারে শ্রীশ্রীমতি মহারাণী কামেশ্বরী, বৃন্দেশ্বরী এবং নিস্তারিণী আই দেবতীর প্রতি রাজ্যের শাসন ভার সমর্পিত হয় এবং মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ গদিতে আরোহণ করেন। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের নামে টাকা মুদ্রিত হয় এবং মৃত রাজার সৎকারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কয়েকদিন পর্য্যন্ত মহারাণীগণ নির্ব্বিবাদে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের মধ্যে মতান্তর এবং বাদ বিসম্বাদ হওয়াতে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে এ সংবাদ অবগত করান। গবর্ণর জেনেরল এবং তদীয় মন্ত্রিসভা এ সংবাদ অবগত হইয়া, কর্ণেল হটন সাহেবের প্রতি এ রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা তদন্তের ভার দেন। উইলের সত্যতা এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে, এই সকলই হটন সাহেবের তদন্তের প্রধান কার্য্য ছিল। কর্ণেল হটন ১৮৬৩ খ্রীঃ ১৫ই অক্টোবর এখানে আইসেন এবং সমুদয় বিষয় সম্যক্ তদন্ত করিয়া ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তদীয় রিপোর্ট প্রদান করেন। তাঁহার রিপোর্ট অনুসারে গবর্ণমেণ্ট মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভুপ বাহাদুরের উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করেন। হটন সাহেব উইল অবিশ্বাস করিয়াছিলেন সুতরাং রাণীদিগের হস্তে রাজ্যভার না রাখিয়া, মহারাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল পর্য্যন্ত, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং রাজ্য-শাসন-ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৬৪ খ্রীঃ

২৬শে জানুয়ারী কর্ণেল হটন সাহেবকে মাসিক দুই সহস্র টাকা বেতনে এ রাজ্যের কমিসনর নিযুক্ত করেন। তাঁহার বেতন রাজকোষ হইতেই দিতে হইত। তিনি ১১ই ফেব্রুয়ারী এখানে পৌঁছিয়া চার্জ্জ গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বের কমিসনরগণ সময়ে সময়ে গুদাম এবং দীন-হাটাতে অবস্থিতি করিতেন। কর্ণেল হটনই প্রথমে নীলকুঠীতে স্বকীয় আবাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে কর্ণেল হটনের প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। "তিনি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কোনও মৌলিক পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খল করার জন্য চেষ্টা করিবেন। কোনও প্রকারের টেক্স ও অন্যান্য খরচ ন্যূন করিতে চেষ্টা করিবেন। রাজা ও তদীয় জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে স্বকীয় রাজ্যশাসনদক্ষ করিতে চেষ্টা করিবেন। স্কুলগুলি ভাল অবস্থায় রাখিবেন। পুলিসের অবস্থা ভাল করিবেন এবং অন্যান্য এই প্রকারের সৎকার্য্য করিতে প্রয়াস পাইবেন।"

কর্ণেল হটন এখানে আসিয়াই রাজসভা উঠাইয়া দেন। এবং রাজসভার কার্য্য কমিসনরের আফিসের দেওয়ানীবিভাগ ভুক্ত করেন। এ রাজ্য হইতে যে কর দেওয়া হয়, তাহা পূর্ব্বে রঙ্গপুরের কালেক্টরীতে দেওয়া হইত, পরে গোয়ালপাড়া দিতে হইত কিন্তু ১৮৬৪ খৃঃ কোচবিহারে গবর্ণমেণ্টের একটী শাখা-ট্রেজারী হওয়াতে ঐ কর কোচবিহার ট্রেজারীতে দাখিল করার নিয়ম হয়। কর্ণেল হটন এখানে আসিয়াই ভুমি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব ও উদ্যোগ করেন এবং পরিশেষে তাহা

কার্য্যেও পরিণত হয়, এই বিষয়ের সম্যক বিবরণ আমরা সাধারণ বিবরণ প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

হটন সাহেবের এখানে আগমনের পূর্ব্বে এ স্থানের সৈন্য সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু সৈন্যগণ নিতান্ত অশিষ্ট ছিল এবং অসজ্জিত থাকিত। ভোটান যুদ্ধে এ সকল সৈন্য দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে পারিবে এই বিবেচনায়, এ বৎসর কাপ্তান হেদাতালীকে মাসিক ৫০০্ শত টাকা বেতনে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তিনি সৈন্যদিগকে এরূপ সুশিক্ষা প্রদান করেন যে, উক্ত যুদ্ধে এই সকল সৈন্য দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভোটান যুদ্ধে এ রাজ্য হইতে যে সকল সৈন্য গিয়াছিল তাহাদের পাথেয় রাজকোষ হইতে দিতে হইয়াছিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ১৮৬৫ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ইহা নির্দ্ধারিত হয়।

এই বৎসরই প্রথম থানার ডাকের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে এরাজ্যে দাস বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব সময়ে তিনি এই প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, পরিশেষে হটন সাহেব ১৮৬৪ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন এবং দাস ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন এরাজ্যে প্রচারিত করিয়াছেন। এরূপ কার্য্য দ্বারা হটন সাহেব যে এ দেশীয় লোকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১৮৬৫ খৃঃ নাজিরদেব প্রতাপনারায়ণ পরলোক গমন করিলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ নাজিরদেবের পদে অভিষিক্ত হন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কর্ণেল হটন ভোটান যুদ্ধে বিশেষ লিপ্ত থাকায়, এখানকার শাসন ভার মেঃ বিভারিজ ডেপুটী কমিসনরের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি কমিসনরগণের অনুমতি মতে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনিই ১৮৬৪-৬৫ সনের বার্ষিক শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্ট দাখিল করেন। ইহাঁর শাসন সময়ে ১৮৫৯ সনের ১০ আইন অংশতঃ এদেশে প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের সহিত সংশ্রব রাখিয়া বিচার করা যাইতে পারে সেই বিষয়ে ফৌজদারী কর্ম্মকারকগণকে আদেশ করা হয়। পুলিস সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। পূর্ব্বে দারোগাগণ ৭।৮ টাকা (নারাণী) বেতন পাইত, কাজেই তাহাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন না করিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইত। এখনে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল এবং কোনও প্রকারের উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিবেন না এরূপ নিয়ম করা হইল। এই সময়ে কর্ণেল ব্রুস প্রতিনিধি কমিসনর ছিলেন। ভূমির রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ানের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এই সময়েই শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ জন্য একটী সভা স্থাপিত হয়। স্থানীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ সভার মেম্বর নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে হটন সাহেবের যত্নে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও সময়ে সময়ে আহ্বান করা হইত এবং তাহাতে রাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব করা হইত।

এই সময়ে সৈন্যসংখ্যা ন্যূন করা হয়। আবশ্যক মতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদ্বারা সহায়তা করিবেন, কাজেই এরাজ্যে সৈন্য রাখার কিছুই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। বিশেষতঃ এই বৎসরেই ভোটানরাজের সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হওয়াতে কোচবিহার ভাবী-বিপদাশঙ্কা হইতে একবারে মুক্ত হয় সুতরাং সৈন্য সংখ্যা ন্যূন করিয়া মাত্র ৮০ জন রাখা হয়। এত অল্প সৈন্যদ্বারা রাজ সম্মান রক্ষা পায়না লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর টেম্পল সাহেব এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু এ পর্য্যন্ত সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। সৈন্যসংখ্যা ন্যূন হওয়াতে কাপ্তান হেদাতালীর আবশ্যকতা থাকে না। তাঁহাকে পুলিসের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের কাজ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া শারীরিক অসুস্থতা ব্যাপদেশে বিদায় লইয়া চলিয়া যান এবং মৌলবী আনোয়ার জেমান পুলিসের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে কমিসনরের অভিমতানুসারে রাজার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের শিক্ষাজন্য রাজব্যয়ে একটী ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়, তাহাতে অদ্যাপি রাজগণেরা অবস্থিতি করিয়া শিক্ষা পাইতেছে। তাহাদের সমুদয় ব্যয়ভার রাজাই বহন করেন। জেঙ্কিন্স স্কুলে অধ্যয়ন জন্য নাজিরদেবকে বিহারে আনা হয় এবং তাঁহার ঋণ পরিশোধার্থ শতকরা বার্ষিক চারি টাকা হার সুদে ৩০০০০ টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়।

১৮৬৬ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে তুফানগঞ্জে একটী মহকুমা স্থাপিত হয়; সম্প্রতি সেখানে একটী থানা মাত্র আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিভারিজ সাহেবের পর স্মিথ সাহেব এস্থানের ডিপুটী কমিসনর হইয়া আইসেন। ইহাঁর সময়ে বিচারাদি সম্বন্ধে ভূরি ভূরি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। দেওয়ানী আদালত, বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের জেলা কোর্টের ন্যায় করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। দেওয়ানী আপীল জজের কার্য্য, ডিপুটী কমিসনরের হস্তে ন্যস্ত হয়। ষ্টাম্প সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন নিয়ম প্রচারিত হয়। এথাকার পুলিস বিভাগ, বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় করার জন্য বিশেষ যত্ন করা হয়। বর্ত্তমান ছাপাখানার দালান এবং বিহার হইতে ধুবড়ি যাতায়াতের পথ এই সময়ে প্রস্তুত হয়।

রাজ বাটীতে অগ্নিকাণ্ড হইয়া সমুদয় কাঁচা ঘর পুড়িয়া যায়। অনাবৃষ্টি বশতঃ কথঞ্চিৎ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল বটে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে কোনও অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে নাই।

১৮৬৮ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী পাঙ্গার রাজকুমারের সহিত রাজকুমারী শ্রীশ্রীমতি আনন্দময়ী আই দেবতীর বিবাহ হয় এবং মহারাজ বেনারসের কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে নীত হন।

কাপ্তান হেদাতালী বিদায় অন্তে উপস্থিত হইলে পুলিসের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের কাজ প্রাপ্ত হন। তিনি এখানে অনেক দিন অবস্থিতি করেন নাই, এই সময়েই তিনি চলিয়া যান। তিনি পরে গবর্ণর জেনে-

রল বাহাদুরের এডিকং হইয়াছিলেন। ভোটান যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শনই এই রূপ পদোন্নতির মূল কারণ।

ভূমির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতে থাকে, এই সময়ে মেঃ বেকেট সাহেবের হস্তে উক্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৮৬৮ খ্রীঃ দেওয়ান নীলকমল সান্যালের মৃত্যু হয় এবং অন্য দেওয়ান মনোনীত হওয়া পর্য্যন্ত বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ দেওয়ানের পদে প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হন। পূর্ত্তবিভাগের তত্ত্বাবধারণ জন্য নেশ নামক জনৈক ইউরোপীয় নিযুক্ত হন। মেঃ স্মিথ বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, তৎপদে প্রথমে মেজর লেন্স এবং পরে বেকেট সাহেব ক্রমান্বয়ে প্রতিনিধি ডিপুটী কমিসনরের কাজ করিতে থাকেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ দেওয়ান আনন্দচন্দ্র ঘোষ কোনও ফৌজদারী মোকদ্দমাতে আবদ্ধ থাকাতে প্রায় চারি মাস কাল রাজস্ব আদায়ের কার্য্য বন্ধ ছিল।

এ বৎসর বর্ত্তমান ফৌজদারী আহেলকার বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পরে সেপ্টেম্বর মাসে বর্ত্তমান দেওয়ান বাবু কালিকাদাস দত্ত মহোদয় স্থায়ী রূপে দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া চার্জ্জ গ্রহণ করেন। এ বৎসর স্থানে স্থানে উলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ১৮৭০ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে রবিন্‌সন সাহেব শিক্ষাবিভাগের প্রধান তত্ত্বাব-

ধায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তিনি অক্টোবর মাসে চলিয়াগেলে পূর্ব্ববৎ স্থানীয় কমিটীর হস্তে শিক্ষা বিভাগের ভার অর্পিত হয়। এ বৎসর পোর্ট ব্লেয়ারের এক জন পলাতক আসামী এখানে ধৃত হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃঃ নেশ সাহেব চলিয়াগেলে ভমজিলিকম সাহেব পূর্ত্তবিভাগের ভার প্রাপ্ত হন।

এ বৎসর সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড নেপিয়র সাহেব এরাজ্য পরিদর্শন করেন। নাজিরদেব রামনারায়ণের মৃত্যু হইলে ১৮৭০ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী তাহার সম্পত্তি রাজ সরকার ভুক্ত করা হয়। পূর্ব্বে নগরস্থ বেশ্যা সকল স্থানে স্থানে বাস করিত, এমন কি ভদ্রলোকের বাটীর নিকটও তাহাদের আবাস বাটী ছিল; এ বৎসর নগরের পূর্ব্বভাগে এক স্থান মনোনীত করিয়া তথায় সমুদয় বেশ্যাদিগকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইটী একটী সু মহৎ কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১৮৭১ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় শিক্ষাবিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন; তিনি এ বৎসরের অধিকাংশ সময় মহারাজার শিক্ষা কার্য্যে বাঁকিপুরে অবস্থান করেন। এই সময়ে মহারাজ বাঁকিপুরে থাকিয়া, পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে স্মিথ সাহেব পুনরায় ফিরিয়া আইসেন; বন্দোবস্তের কার্য্য শেষ হওয়াতে জোতদারগণকে নূতন পাট্টা দেওয়া হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত ইজারাদারী প্রণালী একবারে উঠিয়া যায়। রাজপরিবারের স্ত্রীলোকগণের ভরণ পোষণ জন্য পূর্ব্বে কতক জমি দেওয়া হইত। সেই সকল জমি সরকারে জব্দ করিয়া তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রদান করার নিয়ম হয়। এই বিষয়ে ১৮৬৬ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল বটে কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল না। খাস তহশীলের নিয়ম প্রচারিত হওয়াতে তহশীল কাছারি অধিক হওয়ার আবশ্যকতা জন্মে। অতিশয় দূরতর স্থানে মহকুমা থাকিলে প্রজালোকের বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা বিধায়, মফঃসলে তিনটী মহকুমা স্থাপন করা হয়। মহকুমার কার্য্যকারকদিগকে দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং কালেক্টরীর ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই তিনটী মহকুমা যথা স্থানে প্রজালোকদিগের সুবিধামত সংস্থাপিত হওয়াতে তুফানগঞ্জ এবং লালবাজারে মহকুমা রাখার আবশ্যক করে না, কাজেই ঐ দুই মহকুমা উঠিয়া যায়।

এই সময়ে প্রশস্ত রাজপথ গুলির পার্শ্বে সারবান্ বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ১৮৭২ খ্রীঃ পুলিশের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। এবং ১৮৭৩ খ্রীঃ বর্ত্তমান সিবিলসার্জ্জন মেঃ ব্রিস্কো

চিকিৎসা বিভাগের প্রধান কার্য্যকারক নিযুক্ত হইয়া আইসেন। এই সময়ে প্রত্যেক মহকুমাতে এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ মেয়র সাহেব চলিয়া গেলে বর্ত্তমান সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় পূর্ত্তবিভাগের প্রধান কার্য্যকারক নিযুক্ত হন।

এ বৎসরের প্রধান ঘটনা দুর্ভিক্ষ। দীনহাটা বিভাগের দক্ষিণাংশ এবং লালবাজারের কতক অংশ এই দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইয়াছিল। স্থানীয় অনাবৃষ্টিই দুর্ভিক্ষের কারণ। নিকটবর্ত্তী ইংরেজাধিকৃত প্রদেশ সমূহে প্রথম দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে এ রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ যত্ন এবং অধ্যবসায়ে প্রজালোকের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে নাই। রাজকোষ হইতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হইয়াছিল। সাগরদীঘী এবং লট্‌কাবাড়ী নামক স্থানে সহায়তার কার্য্য আরম্ভ হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই উপলক্ষে উক্ত উভয় স্থানে কতকগুলি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। পর বৎসরের কয়েক মাস পর্য্যন্তও দুর্ভিক্ষকষ্ট বর্ত্তমান ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ দুর্ভিক্ষ সহায়তা কার্য্যে রাজকোষ হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

স্মিথ সাহেবের পর কাপ্তান লুইন সাহেব এ রাজ্যের ডিপুটী কমিসনর হন; তিনি প্রায় এক বৎসর কাল এখানে

ছিলেন। তাঁহার সময়ে আবকারী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় ফলি মারী নামক যে জঙ্গলাবৃত স্থান আছে, তাহা জেলখানার কএদীদ্বারা অংশতঃ আবাদ করা হয় এবং তথায় প্রজা লোক বসতি করিতে থাকে। এই সময়ে জ্বর, বসন্ত ও ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

কলিকাতার লর্ড বিশপ এ রাজ্যে আগমন করেন। তিনি এ রাজ্যের স্কুল ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়া, বিশেষ সন্তুষ্টি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর টেম্পল সাহেবও এ রাজ্য পরিদর্শন করেন; তদীয় আগমন উপলক্ষে, গোবরাছাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার, বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তফী টেম্পল নামে একটী বৃত্তি স্থাপন করেন। সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে ছাত্র সরকারী বৃত্তি পায়না; তাহাকে ঐ বৃত্তি প্রদান করা হয়। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এ রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহার অবিকল অনুবাদ অংশতঃ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

১৮৭৫ সনের ৬ই জুলাই তারিখের বঙ্গ দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের মন্তব্য, প্রথমতঃ এ রাজ্যের শাসন কার্য্যে সম্পূর্ণ একাগ্রতা লক্ষিত হয়। রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে, ব্রিটীশ কর্ম্মচারীর উপর রাজ কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা রাজ্যের মঙ্গল বর্দ্ধনার্থ অত্যন্ত যত্নশীল এবং উৎসাহী। কর্ণেল হটনের বিজ্ঞতা, কার্য্যদক্ষতা এবং দূরদর্শিতাই ইহার মূল কারণ। আমি সর্ব্বত্র কেবল যে, রাজা ও রাজ পরিজনবর্গের উন্নতি চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি এমত নহে, যে প্রজার

মঙ্গলে রাজার মঙ্গল, সেই প্রজাপুঞ্জের উন্নতি চেষ্টাও বিলক্ষণ দেখিতে পাইলাম। প্রজা বৃন্দ অধিকাংশ কৃষি-জীবী বলিয়া, রাজস্বের বন্দোবস্ত ও ভুমির স্বত্ব নিরাকরণ সম্বন্ধে, তত্ত্বাবধায়ক সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হইয়াছেন। তত্ত্বাবধায়ক, দেশীয় কর্ম্মচারিগণ এবং প্রজাবর্গ, সকলেই আমার নিকট এই বন্দোবস্তের ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়াছেন। বন্দোবস্তদ্বারা আয় বৃদ্ধির ফল সন্তোষ জনক হইয়াছে। বাৎসরিক কর সংগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া, ১০ বৎসরের মধ্যে ৩৫০০০০ টাকা হইতে ৫২৫০০০৲ টাকা হইয়াছে এবং ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে। গত কয়েক বৎ-সরের মধ্যে কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, সকলেই স্বীকার করেন। রাজকোষেও অধিক পরিমাণে অর্থাগম হইয়াছে। পূর্ব্বে ভিন্ন দেশীয় লোকদিগকে ভূমি ইজারা দেওয়া হইত, এক্ষণে সে নিয়ম রহিত হইয়াছে। ভরসা করি কখনও পুনঃ প্রচলিত হইবে না। কোন প্রকার আবোয়াব এবং রাহাদারী মাশুল গৃহীত হয়না। সকল প্রকার কৃষি কার্য্যেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে, অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভূমি কর্ষিত দৃষ্ট হয়। এখানে আর টাকা মুদ্রিত হয়না। কোম্পানির টাকা প্রচলিত আছে। কেবল নৃপতিগণের অভিষেক সময়ে, তাঁহাদের গৌরবার্থে অল্প পরিমাণ মুদ্রা মুদ্রিত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে, এখানেও দ্রব্যের উপর কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে দেখিয়া, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; কর সংস্থাপন দ্বারা সুরাপান নিবারণ স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের ব্যবহার সঙ্গত বটে।

মুদ্রিত কাগজের কার্য্য ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। কিন্তু রাজার নামে বিলাত হইতে কাগজ মুদ্রিত করাইয়া আনা হয়। শকটের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া, পথ ও সেতুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে স্পষ্ট অনুভূত হয়। শিক্ষাবিভাগ সংস্থাপিত হওয়ায়, এ দেশের অনেক উপকার হইতেছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ হইয়াছে। পুলিসের সংখ্যা অধিক নহে, ১৯৫ জন মাত্র। আমি যে সকল পুলিসের লোক দেখিয়াছি, তাহারা সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত।

পূর্ব্বে আমি অনেক স্থলে প্রধান প্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণের প্রশংসা করিয়াছি, বাস্তবিক কতকগুলি উত্তম ও সুশিক্ষিত দেশীয় কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইয়া, রাজকার্য্যে নিয়োজিত হওয়ায়, রাজ্যের এক প্রধান গৌরবের কারণ হইয়াছে। রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, রাজকার্য্যে প্রবৃত্তিকালে এরূপ সুদক্ষ কর্ম্মচারিবৃন্দ পাইয়া, উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

সিপাহীর সংখ্যা অতি অল্প, এক শতের অধিক নহে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দত্ত দুইটী যুদ্ধের কামান আছে। ভোটযুদ্ধ সময়ে কোচবিহারের রাজার সহস্র সৈন্য ছিল; যুদ্ধান্তে তাহাদিগকে অবসৃত করা হয়: ইহাদের মধ্যে কয়েক জন যুদ্ধ কার্য্যে পারদর্শিতা জন্য রৌপ্য পদক পাইয়াছে, আমি স্বহস্তে তাহাদিগকে ঐ সকল পদক দিয়াছি। যদিও এ রাজ্যে সৈন্য সংস্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি ভোটানের নিকটস্থ বলিয়া, রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য সৈন্য সংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করা

আবশ্যক। ২০।৩০ জন অশ্বারোহীও নিযুক্ত হইতে পারে। এক্ষণে অশ্বারোহী প্রায় নাই বলিলেই হয়, আমার পরিদর্শন কালে অতি অল্প সংখ্যা এমন কি ৫।৬ জন মাত্র ছিল।

সংক্ষেপে কোচবিহার রাজ্য শাসন উত্তম রূপে চলিতেছে, এবং ভবিষ্যতে এরূপ ভাবেই চলিবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায়। আমি ভরসা করি বর্ত্তমান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তান লুইন সাহেব, এই রাজ্যের প্রাচীন আচার ব্যবহার এরূপ সংরক্ষণ করিবেন যে, রাজা রাজ্যভার গ্রহণকালে আপন রাজ্য, অন্য রাজ্যের আদর্শ স্বরূপ দেখিতে পান।

১৮৭৫।৭৬ সনের অধিকাংশ সময় কাপ্তান লুইন এখানে ছিলেন, পরে মেঃ ডেলটন ডিপুটী কমিসনর হইয়া আইসেন এবং ঐ সনের রিপোর্ট দাখিল করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মেঃ ডেল্‌টনের সময়েই এ রাজ্যে গ্রাম্য চৌকিদার সৃষ্টির প্রস্তাবনা আরম্ভ হয় এবং পরিশেষে তাহা কার্য্যেও পরিণত হয়। এখন প্রত্যেক গ্রামেই দুইজন একজন, স্থান বিশেষে তিনজন চৌকিদার আছে। গ্রাম্য লোকেরাই তাহাদের বেতন প্রদান করিয়া থাকে। চৌকিদারগণ প্রতি সপ্তাহে থানায় হাজির হইয়া, গ্রামের সমুদয় সংবাদ প্রদান করে। গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত প্রদেশ

সমূহের মত পঞ্চাইত প্রণালী প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাব হইতেছে, বোধ হয় শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। মেঃ ডেলটন সাহেবের সময়ে, ডাক্তারখানা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাছারী, রাজার স্নানগৃহ, জেলখানার চতুর্দ্দিকস্থ ইষ্টকময় প্রাচীর প্রস্তুত হয়। সুনীতি সেতু নামক একটী উৎকৃষ্ট লৌহসেতু রাজধানী হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে তোর্ষা নদীর উপর প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৭৭ খৃঃ প্রথমে অতি বৃষ্টি এবং শেষে নিয়মিত বৃষ্টি না হওয়াতে শস্যের পক্ষে বিলক্ষণ হানি হইয়াছিল; এমন কি, গড়ে দশ আনা শস্যও হইয়াছিল না; সেপ্টেম্বর মাসে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে তামাকেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

এই সময়ে শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটে। সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য যে সকল টাকা ব্যয় হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে বৃদ্ধি পাইতে পারিত; কিন্তু এখন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বিবেচনা করিলেন যে, ঐ বিষয়ে যত ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা হইতে আর অধিক বৃদ্ধি করা উচিত নহে। রাজা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, এত অধিক ব্যয় দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং তদ্ধেতু ব্যয় ন্যূন করিলে, সমুদয় সুশৃঙ্খলা বিলোপ পাইবার সম্ভাবনা সুতরাং এখন আর ব্যয় বৃদ্ধি করা যাইবে না।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ কলিকাতাতে আনীত হন। উক্ত সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লী নগরীতে যে প্রসিদ্ধ দরবার হয়, তাহাতে মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষ হইতে, তাঁহাকে ভারতে-

শ্বরীর নামযুক্ত পতাকা ও পদক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তদানিন্তনীয় গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন বাহাদুর, মহারাজকে এক মূল্যবান্ তরবারি প্রদান করেন।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে, খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা, সুনীতি বালার সহিত মহারাজের বিবাহ হয়। ১৫ই মার্চ্চ তারিখে, মহারাজ ইংলণ্ডে চলিয়া যান। অনধিক এক বৎসর কাল তথায় অবস্থান করিয়া, ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। শেষোক্ত স্থানে তিনি রাজ বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে, তিনি মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের সঙ্গে, বিশেষ বন্ধু ভাব হইয়াছিল। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দের ৩রা মার্চ্চ, তিনি স্বরাজ্যে পুনরাগমন করেন। অতঃপর কলিকাতাতে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই উত্তর বঙ্গ রাজকীয় রেল পথে লোক গমনাগমনের কার্য্য আরম্ভ হয়। বিহারের লোক সকল এ রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তস্থিত হলদিবাড়ী ষ্টেশন হইয়া যাতায়াত করিতে থাকে। হলদিবাড়ী হইতে বিহার পর্য্যন্ত ৪৩ মাইল দীর্ঘ একটী রাজ পথ, এই সময়েই সম্পূর্ণ রূপ প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি বিহার হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণে, মোগলহাট নামক স্থানে, রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। রাজধানীর এবং রাজ্যের

অধিকাংশ লোক উক্ত ষ্টেশন হইয়া যাতায়াত করে। এইটী উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের একটী শাখা মাত্র। এই রেলওয়ে রাজ ব্যয়ে রাজধানী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করার প্রস্তাব হইয়াছে, শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে।

১৮৭৮ খ্রীঃ জুন মাসে বিলক্ষণ অতিবৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং জুলাই মাসে বন্যা হইয়া, প্রায় সমুদায় কোচবিহার প্লাবিত করিয়াছিল; এমন কি রাজধানীর উপর ৩ ফুট জল উঠিয়াছিল। দেওয়ান মহোদয়ের মতে বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে এরূপ বন্যা কখন হয় নাই। বৃদ্ধ লোকেরা বলে তাহাদের জীবনে আর এক বার মাত্র এরূপ বন্যা দেখিয়াছে। কিন্তু কোন্ সময়ে দেখিয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারেনা। এই বন্যাতে রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। শস্যাদি একে বারে নষ্ট হইয়া যায়। বিগত বৎসর শস্যের অল্পতা এবং বর্ত্তমান সনের সম্পূর্ণ হানিতে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সুদৃষ্টি থাকাতে, লোক সমূহের অধিক ক্ষতি হইতে পারে নাই। বন্যার প্রভাবে কাষ্ঠ সেতু সকল অধিকাংশ বিনষ্ট হয়; পর বৎসর সে সকল পুনরায় প্রস্তুত হইয়াছে। এই বৎসর স্থানীয় অবস্থা তদন্তের জন্য মাল কাছারীর অধীনে ৬ জন কানুনগু নিযুক্ত হন।

এই বৎসরই আমেরিকীয় এবং স্পেন দেশীয় প্রণালী অনুসারে তামাক প্রস্তুতির কার্য্য আরম্ভ হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার অধীনে কাউয়ারডারা এবং অন্যান্য স্থানে তামাকের আবাদ হইত এবং কাউয়ারডাড়ার কারখানাতে প্রস্তুতি কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। প্রথমে এক

জন আমেরিকীয় প্রণালীর কার্য্যকারক এবং পরে এক জন স্পেনীয় প্রণালীর কার্য্যকারক নিযুক্ত হন। এ বৎসর এই কার্য্যে দশ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু উৎপন্ন তামাকের মূল্য ৫ কি ৬ সহস্র টাকার অধিক হয় নাই। এই রূপ তামাক প্রস্তুতির কার্য্য পর বৎসরও কথঞ্চিৎ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্যয় বাহুল্য বিধায় ঐ কার্য্য স্থগিত আছে।

১৮৭৯ খ্রীঃ রেজেষ্টরী সম্বন্ধীয় ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সনের তিন আইন এ প্রদেশে প্রচলিত হয়। দেশীয় মদ্য প্রস্তুত প্রণালীও প্রবর্ত্তিত হয়। এ বৎসর তমাদি আইন সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হওয়াতে, মোকদ্দমার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। এবং ষ্টাম্প বিক্রী দ্বারাও রাজকীয় লাভ যথেষ্ট হইয়াছিল।

১৮৮০ খ্রীঃ হইতেই লোক সংখ্যা নির্ণয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে ১৮৮১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে লোক সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে এই কার্য্যে অনেক স্থানের প্রজাগণ অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রতিবাদ করিতে থাকে এবং কার্য্যকারকদিগের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মায়। কিন্তু সময় কালে সমুচিত শাসনে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই, কার্য্য সুন্দর রূপ নির্ব্বাহিত হইয়াছে। এই কার্য্যে প্রায় ছয় মাস কাল রাজকীয় অধিকাংশ কার্য্যকারক এত দূর ব্যাপৃত ছিলেন যে, কেহই স্বকীয় কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোভিনিবেশ করিতে পারেন নাই, কাজেই প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যেরই আংশিক ক্ষতি হইয়াছিল। এই কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার শ্রীযুক্ত দেওয়ান মহোদয়ের হস্তে

ন্যস্ত ছিল। এই কার্য্য সম্বন্ধে তিনি অপরিসীম পরিশ্রম এবং দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই বৎসরই গবোৎপাদক কার্য্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়; পশ্চিম দেশ হইতে কয়েকটী যাঁড় আনা হয়। এই বিষয়ের সম্যক বিবরণ আমরা ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

এই সময়ে রঙ্গপুরের পুলিশ সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেঃ হেরিশ, এ রাজ্যের পুলিশের কার্য্য তদন্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তিনি এ রাজ্যের যাবতীয় পুলিশ ষ্টেসন পরিদর্শন করিয়া, সন্তুষ্টি লাভ করেন এবং গবর্ণমেণ্টে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রদান করেন। পুলিশের উন্নতি পক্ষে সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, এ রূপ তদীয় মন্তব্যে প্রকাশ পায়। তাঁহার মন্তব্য অনুযায়ী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

রাজকীয় সাহায্য শতকরা দশ টাকা ন্যূন হওয়াতে, এ বৎসর অনেকগুলি স্কুল ও পাঠশালা উঠিয়া যায়। ১৮৮০ সনের আগষ্ট মাসে, শিক্ষা বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়, পরলোক গমন করাতে, বর্ত্তমান প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দাস, ডিসেম্বর মাসে তৎপদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

১৮৮১ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে, মেঃ ডেল্টন মহোদয় বিদায় লইয়া চলিয়া যান এবং তৎপদে কাপ্তান গর্ডন প্রতিনিধি

নিযুক্ত হন, এবং ১৮৮০।৮১ সনের বার্ষিক শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রদান করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর এশলি ইডেন সাহেব, তদীয় বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে এ রাজ্যে উপস্থিত হন। তিনি আট দিবস কাল এ রাজ্যে অবস্থিতি করেন। এ রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত জঙ্গলময় প্রদেশে শিকার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শিকার স্থানেই সমুদয় সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। যে দিবস এখানে আগমন করেন, সেই দিবস আফিসাদির প্রতি এক বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার আগমনে বিলক্ষণ সমারোহ হইয়াছিল। সমুদয় নগরী আলোকিত করা হইয়াছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ ১১ই এপ্রিল তারিখে রাজকুমার জন্ম গ্রহণ করেন; তদুপলক্ষে কলিকাতা এবং রাজধানীতে কয়েক দিবস বিলক্ষণ আমোদ হইয়াছিল।

১৮৮২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে, বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর রিভার্স টমসন সাহেব, এ রাজ্যে আগমন করেন। এ রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা পরিদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মাত্র ২৪ ঘণ্টাকাল এখানেঅবস্থিতি করেন এবং আফিসাদি পরিদর্শন করেন।

১৮৮২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে, প্রতিনিধি ডিপুটী কমিসনর কাপ্তান গর্ডন চলিয়া যান এবং পুনরায় মেঃ ডেল্টন আগমন করেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

এ বৎসর এ দেশীয় প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তামাক এবং কোষ্ঠা অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হওয়াতে, প্রজা সমূহের আয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হয়, তদ্ধেতু রাজস্বও নিয়মিত মতে আদায় হয় না; এমন কি বিগত বৎসর হইতে প্রায় ২১০০০ টাকা ন্যূন আদায় হয়।

এই সময়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ভার দেওয়ানের হস্তে ন্যস্ত হয়। অনেকগুলি মহাল ত্যাগ করিয়া, মাত্র ৪।৫ টী রাখা হয় এবং তজ্জন্য এক জন জেনেরল মেনেজার নিযুক্ত করা হয়। মহালের খাজানাদি আদায় সম্বন্ধে ও বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হয়।

এই সময়ে কৃষি ও বন বিভাগ নামে একটী নূতন বিভাগ সংস্থাপিত হয়। ইংলণ্ডের সাইরান সিষ্টার কলেজের কৃষি-বিদ্যা পরীক্ষোত্তীর্ণ কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ এই বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যে নিযুক্ত হন। গবোৎপাদক কার্য্যালয়ের কার্য্যও এই বিভাগ সন্নিবিষ্ট হয়। কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান মহোদয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন।

এ বৎসর স্থানীয় পুলিশের অবস্থা তদন্ত জন্য, গবর্ণমেণ্ট হইতে ডিষ্ট্রিক্ট সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেঃ মনরো এ রাজ্যে আগমন করেন। তিনি পুলিশ বিভাগ সম্যক্ তদন্ত করিয়া, হিসাবাদি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ প্রদর্শন করেন বটে কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েরই প্রশংসা করিয়াছেন।

এ বৎসর কোচবিহারের সর্ব্বত্রই ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সদর ও দীনহাটা বিভাগেই অধিক দিন স্থায়ী ছিল।

বর্দ্ধমান বিভাগের সহকারী ইনিস্পেক্টর বাবু ব্রহ্ম মোহন মল্লিক, এ রাজ্যস্থ সাহায্যকৃত স্কুলগুলির অবস্থা তদন্ত করার জন্য, গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে, এ স্থানে আগমন করেন। বর্ত্তমান সময়ে, কি নিয়মে সাহায্য দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে কি নিয়মে সাহায্য প্রদান করিলে এতদপেক্ষা ভাল হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় তদন্ত করার ভার তাঁহার প্রতি ছিল। তিনি প্রায় দুই মাস কাল এ স্থানে অবস্থান করিয়া, অনেকগুলি স্কুল পরিদর্শন করেন এবং গবর্ণমেণ্টে এক বিস্তৃত রিপোর্ট প্রদান করেন। মহারাজ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করাতে, গবর্ণমেণ্ট সেই রিপোর্টে কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, তাহা মহারাজ এবং তদীয় মন্ত্রি সভায় প্রেরণ করেন। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বহুবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

১৮৮৩ খৃঃ জানুয়ারী মাসে কোচবিহারে রাজকুমারের অন্নারম্ভ হয়, এবং তিনি রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ নামে অভিহিত হন।

কৃষ্ণনগর মেলেরিয়া প্রধান স্থান এবং অস্বাস্থ্য কর বোধে বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকগণ আপত্তি উত্থাপন করে, কাজেই রাজগণ বোর্ডিং স্কুল কৃষ্ণনগর হইতে বাঁকিপুরে নীত হয়।

১৮৮৩ খৃঃ জুলাই মাস হইতে থানার ডাক উঠিয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের ডাকে রাজকীয় পত্রাদি প্রচলন জন্য

বন্দোবস্ত করা হয়। রাজকীয় কর্ম্মকারকগণ সার্ব্বিস-ষ্টাম্প ব্যবহারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিংশ অধ্যায়।

উপসংহার।

১৮৮৩ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর তারিখে, মহারাজের রাজ্যভার গ্রহণ করার প্রকৃত সময় ছিল কিন্তু নানাবিধ অসুবিধা বশতঃ তিনি ৮ই নবেম্বর তারিখে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্যভার গ্রহণের অনতিপূর্ব্বে কমিসনর, ডিপুটী কমিসনর এবং দেওয়ান বাহাদুর একত্রে পরামর্শ করিয়া, ভবিষ্যৎ শাসন সম্বন্ধে এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। মহারাজ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, তাহা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সদনে পাঠান হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টও তাহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করাতে, ৯ই নবেম্বর মহারাজ ঘোষণা পত্রদ্বারা তাহা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান।

৮ই নবেম্বর তারিখে মহাসমারোহের সহিত মহারাজ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর রিভার্শ টমসন মহোদয়, তদীয় মন্ত্রিগণ সহ, এ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাজসাহী ও কোচবিহার বিভাগের কমিসনর এবং অন্যান্য কতিপয় ইংরেজ কর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩০।৪০ জন বেসরকারী ইয়ুরোপিয়ানও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দেশীয় মান্যগণ্য

বহুবিধ ভদ্রলোকও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ, দীঘাপাতিয়ার রাজা, পাইকপাড়া নিবাসী কুমার ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ, নবাব আবদুল লতিফ্ খাঁ বাহাদুর এবং পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ইহাঁরাই প্রধান।

দেশীয় এবং বিদেশীয় প্রায় ৫০ সহস্র লোক সহরে সমবেত হইয়াছিল। নাটকাভিনয়, যাত্রা, নাচ প্রভৃতি বিবিধ আমোদ বহু দিবস পর্য্যন্ত ছিল। নীলকুঠীতে মহাসমারোহের সহিত সাহেবদিগের নাচ ও ভোজ হইয়াছিল। নবদ্বীপ এবং বিক্রমপুরের কয়েক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবদিগকে যথোচিত দান করা হইয়াছিল। ৮ই নবেম্বর রাত্রে বহুবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আতস বাজী হইয়াছিল।

৮ই নবেম্বর বেলা ১১ ঘটিকার সময় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রকাশ্য দরবারে মহারাজকে রাজ্যভার প্রদান করেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলেন : "মহারাজ? আমি অদ্য এস্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার রাজ্য আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আপনার অপ্রাপ্ত বয়স্কতা নিবন্ধন, এ রাজ্য প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে ছিল। ইহা আমার অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, আপনাকে অনেক দিন হইতে জানি এবং আমরা উপযুক্ত পাত্রে ক্ষমতা অর্পণ করিতেছি। উত্তরাধিকারী স্বত্বেই যে আপনি এ রাজ্যে স্বত্ববান্ কেবল এমত নহে, আপনার শারীরিক এবং

মানসিক ক্ষমতা গুণে ও আপনি রাজ্য শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বত্ববান্। আমার ইহাও সুখের বিষয় যে, গবর্ণমেণ্ট যে অভিপ্রায়ে এ রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপ সুসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে রাজ্যের সম্যক উন্নতি হইয়াছে। আমার এমত সময় নাই যে, প্রত্যেক বিভাগে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা বিশদ রূপে বর্ণন করি ; কিন্তু সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সমুদয় বিভাগের কার্য্যই গবর্ণমেণ্ট আদর্শে সুশৃঙ্খল করা হইয়াছে। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে যখন গবর্ণমেণ্ট এ রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন এ রাজ্যে ২টী স্কুল এবং ১৫০ জন মাত্র ছাত্র অধ্যয়ন করিত, সম্প্রতি ৩৩০টী স্কুল এবং প্রায় ১০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, তন্মধ্যে ২৪টী বালিকা স্কুলে ন্যুনাধিক তিনশত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে।

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে, পূর্ত্তবিভাগের বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, রাজপথ সকল কাষ্ঠময় সেতু সহ, বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি কৃষি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ডাক ও টেলিগ্রাফ পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। এতদ্দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সুসভ্যতার প্রারম্ভ সূচক সকল কার্য্যই আরম্ভ হইয়াছে। যদি চ এই সকল বিভাগে লাভের সম্ভাবনা নাই, তথাচ আমি ভরসা করি এ সকল বিভাগ আপনি রীতিমত স্থায়ী রাখিবেন। যিনি শিক্ষা এবং পূর্ত্ত বিভাগাদি উঠাইয়া দিয়া, ব্যয় সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন,

তিনি আমার মতে উত্তম শাসন কর্ত্তা নহেন; কারণ লোকের অজ্ঞানতা বৃদ্ধি এবং স্বাধীনতার ন্যূন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরিদ্রতা ঘটিয়া উঠে; তদ্ধেতু রাজার আয়েরও অনেক লাঘব হয়। আপনার বহুদর্শী দেওয়ান সমুদয় রাজ্য সুন্দররূপ জরিপ করিয়া, রাজস্ব সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি সংসাধন করিয়াছেন। আমি ভরসা করি, ভবিষ্যতে বন্দোবস্ত করিতে সহজহারে, অধিক দিনের জন্য, বন্দোবস্ত করিবেন; যেন কৃষকেরা সেই সময় মধ্যে, কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিতে পারে।

আপনি রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যেরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন, প্রকাশ করিয়াছেন; তাহা হইতে আর উত্তম নীতি কি হইতে পারে? রাজ সভা সংস্থাপন সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। আপনার অনুপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে। আপনি অনেক দিন ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়াছেন। নানা স্থানে বহু বিধ ভদ্র ইংরেজের সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। আপনি যে কেবল ইংরেজী ভাষাতেই অধিকার লাভ করিয়াছেন এমত নহে; আমাদের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার অনেক শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আমাদের কোন দোষকর ব্যবহার অনুকরণ করেন নাই।

আপনার এই রাজ্যভার গ্রহণে আমি নিতান্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনি স্বকীয় দুরভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই এ রূপ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন এমত নহে, অদ্য জগৎপাতা পরমেশ্বর প্রায় ৬ লক্ষ লোকের প্রতিনিধিত্ব আপনার হস্তে সমর্পণ করিলেন, সুতরাং সেই

গুরুতর ভার আপনার এরূপ সতর্কতা এবং বিশ্বাসের সহিত বহন করা উচিত, যেন অন্তিম কালে আপনার কার্য্যভার স্মরণ করিয়া, আপনি আনন্দ অনুভব করিতে পারেন।”

পরিশেষে মহারাজ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন।

“আমি এবং আমার রাজ্য যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে সমধিক উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি প্রকাশ্য সভাতে, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যাঁহার প্রতিনিধিগণ হইতে আমি ও আমার রাজ্য নানা প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, সেই শ্রীশ্রীমতি মহারাণী সম্রাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্টে, আমার অসন্দিগ্ধ ভক্তি কখনও বিচলিত হইবেনা।

এ রাজ্য সুচারু রূপ শাসন সম্বন্ধে, আমি কমিসনর লর্ড ইউলিকব্রাউন, ডিপুটী কমিসনর মেঃ ডেল্টন এবং দেওয়ান রায় কালিকাদাসদত্তকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাকে আমার পৈত্রিক গদিতে বসাইবার জন্য, মহামতি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে বঙ্গদেশের এক প্রান্তভাগে আসিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ ও আপ্যায়িত হইলাম। যে ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা আমি ন্যায় মতে সম্পন্ন করিতে যত্নের ত্রুটী করিব না।”

৯ই নবেম্বর তারিখে মহারাজ স্বয়ং এক দরবার করেন। সেই দরবারে দেওয়ান মহোদয় অন্যান্য রাজ

কর্ম্মচারী, জমিদার এবং ভদ্রলোকদিগকে, মহারাজের নিকট পরিচিত করিয়া দেন।

উপাধিধারী পণ্ডিত ভাম্বুনাথ, রামশঙ্কর, মদনাথ এবং সীতানাথ ভট্টাচার্য্য মহারাজের নিকট পরিচিত হইলে, তাঁহাদের প্রত্যেকের মাসিক দশ টাকা হারে, জীবিত কালের নিমিত্ত, বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়।

সীতাই নিবাসী জোতদার খেরুনস্য পাটোয়ারী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণের উপকারার্থ, একটী ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে বলিয়া, তাহাকে খেলাত এবং চৌধুরি উপাধি প্রদান করা হয়। পরে সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত ঘোষণা পত্র প্রকাশ্য দরবারে পাঠ করা হয়।

৯ই নবেম্বর তারিখের ঘোষণা পত্র।

"মহারাজ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঘোষণা পত্রদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে, বর্ত্তমান রাজ্য শাসন প্রণালীর জন্য, মহারাজ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সমধিক ঋণী আছেন, কারণ এতদ্দ্বারা তাঁহার রাজ্যের এবং প্রজাবৃন্দের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে। এই শাসন প্রণালী উৎকৃষ্ট মনে করিয়া, মহারাজ ইহার সার মর্ম্মানুসারে, রাজ্য শাসন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তদীয় পূর্ব্ব পুরুষেরা রাজ্য শাসন বিষয়ে, যে সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতেন,

অতঃপর আবশ্যক বিবেচনা করিলে, সেই সমস্ত ক্ষমতা তিনি স্বয়ং পরিচালন করিবেন। সম্প্রতি কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে, সুপরামর্শ গ্রহণ করিবার অভিলাষে, একটী রাজ সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাপ্তান এ ইভান্স গর্ডন, দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর এবং অতঃপর যিনি প্রধান দেওয়ানী বিচারক নিযুক্ত হইবেন, * এই তিন জন উক্ত সভার সভ্য মনোনীত হইলেন, মহারাজ স্বয়ং সভাপতি থাকিবেন। মহারাজের অনুপস্থিতিতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সহকারী সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

ফৌজদারী, পুলিশ, সেনা, জেল, পূর্ত্ত, শিক্ষা এবং অডিটবিভাগ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের শাসনাধীনে থাকিবে। তিনি এই সকল বিভাগের কার্য্য প্রণালীর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধারণ করিবেন। তিনি সেসন জজের কার্য্য করিবেন। সেসন জজের নিকট সাধারণতঃ যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল হইয়া থাকে, ঐ সমস্ত আপীল তাঁহার নিকট হইবে। তিনি রাজসভা ব্যতীত অন্যত্র দেওয়ানী বিচারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

রাজস্ব বিভাগের সম্পূর্ণ ভার দেওয়ানের হস্তে থাকিবে। তিনি সর্ব্ব প্রকার রাজকর আদায়ের জন্য দায়ী থাকিবেন। এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। রাজ সভার অন্যতর সভ্য প্রধান

* শ্রীযুক্ত রায় বলরামমল্লিক বাহাদুর এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট প্রদেশে সবর্ডিনেট জজ ছিলেন।

দেওয়ানী বিচারক, দেওয়ানী এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় কয়েক শ্রেণীর মোকদ্দমার আপীল শুনিবেন। এবং দেওয়ানী বিচার সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। চূড়ান্ত আপীল সমস্ত রাজ সভায় হইবে।

মহারাজের চাকলাজাত জমিদারীর কার্য্য, রাজ সভার কর্ত্তৃত্ত্বাধীনে শ্রীযুক্ত রায় তারকনাথ মল্লিক বাহাদুর নির্ব্বাহ করিবেন। এই সকল জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে, তিনি রাজ সভার একজন সভ্য হইবেন। অন্যান্য সভ্যদিগের ন্যায় তাঁহারও মতামত দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

কয়েকটী কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মচারী তাঁহাদের বর্ত্তমান পদে এবং বেতনে স্থায়ী রহিলেন। মহারাজের পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, যে সকল আইন প্রচলন করিয়াছেন এবং যে সকল অঙ্গীকার পত্র এবং পেন্সন প্রদান করিয়াছেন, তাহা বলবৎ রহিল। বৃটিশ রাজ্যের প্রচলিত নিয়মানুসারে যেরূপ পেন্‌সন দেওয়া হইতেছে সেই রূপ দেওয়া হইবে।

রাজস্ব সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান প্রচলিত বন্দোবস্ত, ১২৯১ সাল হইতে ৫ বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে। কেবল যে সমস্ত পতিত ভুমি, বন্দোবস্তের সময় হইতে আবাদী হইয়াছে, তাহার পূর্ণ নিরিখে কর অবধারিত হইবে।

মহারাজ রাজধানীর সহিত বঙ্গ দেশীয় রেলওয়ে সমূহের যোগ করিবার অভিলাষী থাকায়; গীতলদহ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন।”

১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ১৯শে নবেম্বর, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সমূহের ক্ষমতা বিষয়ে, রাজসভা হইতে নিম্নলিখিত ঘোষণা পত্র প্রচারিত হয়।

১। রাজ্যের শ্রীযুক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহোদয়, সেসন জজ অর্থাৎ দওরার বিচারপতি হইলেন; তিনি সেসন জজের বিচার্য্য ফৌজদারী আপীল সমূহের বিচার করিবেন।

২। শ্রীযুক্ত ফৌজদারী আহেলকার বাবু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, তাহার আপীল শুনিবেন। যে সকল মোকদ্দমার বিচার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা করিবেন, তাহার আপীল সেসন জজের নিকট হইবে।

৩। শ্রীযুক্ত দেওয়ান রায় বাহাদুর মহোদয়, বিচার সম্বন্ধীয় কোনও ক্ষমতা পরিচালন করিবেন না। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মকারকগণ রাজস্ব বাকী সম্বন্ধে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন, তাহার আপীল দেওয়ানী আদালতে হইবে। কিন্তু নিম্ন আদালত রাজস্ব বাকী জন্য নিলাম ও নামজারী ইত্যাদি রাজস্ব সম্বন্ধীয় যে সকল মোকদ্দমার সরাসরী বিচার করিয়া থাকেন, তাহার বিরুদ্ধে আপীল শ্রীযুক্ত দেওয়ান বাহাদুরের নিকট হইবে। এই সকল মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী এরূপ হইবে যে, চূড়ান্ত আদেশ, প্রথমতঃ মহকুমার বিচারক প্রদান করিবেন, সেই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দেওয়ান মহোদয়ের নিকট হইবে; আইনে বিধান থাকিলে তাঁহার বিচার্য্য মোকদ্দমার আপীল রাজ সভায় করিতে হইবে।

৪। দেওয়ানী প্রধান বিচারক কোচবিহারে সিভিল জজ নামে অভিহিত হইবেন।

৫। ১০০৲ শত টাকা পর্য্যন্ত দাবী বিশিষ্ট, রাজস্ব বাকী মোকদ্দমার আপীল, শ্রীযুক্ত সিভিল জজ মহোদয়ের নিকট হইবে।

৬। মাল কাছারীর নাএব আহেলকার বাবুকে কার্য্যতঃ সদর মহকুমার কার্য্যকারক রূপে গণ্য করিতে হইবে। তিনি সমস্ত আসল আরজী এবং দরখাস্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিবেন, এবং তৎসমন্ধে অন্যান্য মহকুমার নাএব আহেল-কারের ন্যায় চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। রাজ সভার দেওয়ানী বিভাগের সভ্য মহোদয়, দেওয়ানী ও রাজস্ব সমন্ধীয় একশত টাকার অধিক এবং অনধিক দাবীর ছোট আদালতের মোকদ্দমার, এবং ৫০৲ টাকার অধিক ও অনধিক দাবীর অন্যান্য প্রকারের মোকদ্দমার আপীল শুনিবেন। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী ও রাজস্ব বাকীর মূল মোকদ্দমা পাঁচশত টাকার অধিক দাবীর হইলে তাঁহার নিকট রুজু হইবে। দেওয়ানী বিচার সমন্ধীয় কার্য্য কর্ম্মের এই স্থিরতর বন্দোবস্ত নহে। আবশ্যক হইলে, ইহার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে। বৃটিশ শাসনাধীন প্রদেশ সমূহের সিভিল জজেরা শার্টিফিকেট ঘটিত এবং অন্যান্য এই প্রকারের যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, এস্থানের সিভিল জজও তদ্রূপ করিবেন। নিম্নলিখিত আপীল সকল রাজ সভায় হইতে পারিবে।

ক। সেসন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল।

খ। দেওয়ানী আপীল, যাহাতে আইন এবং বৃত্তান্ত ঘটিত তর্ক আছে এবং যে মূল মোকদ্দমা সিভিল জজ নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

গ। অন্যান্য ও রাজস্ব বিষয়ক মোকদ্দমার খাস আপীল, যাহাতে কেবল আইন ঘটিত কোন তর্ক আছে।

প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যেক স্থলে রাজ সভাদ্বারা মঞ্জুর করাইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আপীল অনাবশ্যক।

অন্যান্য বিষয় যাহা উপরে বিধিবদ্ধ হয় নাই, সেই সকল বিষয়ে কার্য্যকারকগণ বর্ত্তমান সময়ে, যে যে ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন এবং যে যে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাই করিবেন।

সমাপ্ত।

	রাজার নাম	রাজ্যাভিষেকের সময়	রাজত্বকাল
১।	চন্দন	১৫১০ খ্রীঃ	১৩
২।	বিশ্বসিংহ [বৈমাত্রেয় ভ্রাতা]	১৫২৩ ,,	৩১
৩।	নরনারায়ণ [পুত্র]	১৫৫৪ ,,	৩৪
৪।	লক্ষ্মীনারায়ণ [পুত্র]	১৫৮৮ ,,	৩৩
৫।	বীরনারায়ণ [পুত্র]	১৬২১ ,,	৫
৬।	প্রাণনারায়ণ [পুত্র]	১৬২৬ ,,	৩৯
৭।	মোদনারায়ণ [পুত্র]	১৬৬৫ ,,	১৫
৮।	বসুদেবনারায়ণ [ভ্রাতা]	১৬৮০ ,,	২
৯।	মহেন্দ্রনারায়ণ [ভ্রাতৃ পৌত্র]	১৬৮২ ,,	১২
১০।	রূপনারায়ণ [জ্ঞাতি ভ্রাতা]	১৬৯৪ ,,	২০
১১।	উপেন্দ্রনারায়ণ [পুত্র]	১৭১৪ ,,	৪৯
১২।	দেবেন্দ্রনারায়ণ [পুত্র]	১৭৬৩ ,,	২
১৩।	ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ [জ্ঞাতি ভ্রাতা]	১৭৬৫ ,,	৫
১৪।	রাজেন্দ্রনারায়ণ [জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা]	১৭৭০ ,,	২
১৫।	ধরেন্দ্রনারায়ণ [ভ্রাতুষ্পুত্র]	১৭৭২ ,,	২
১৬।	ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ * [পিতা]	১৭৭৪ ,,	৯
১৭।	হরেন্দ্রনারায়ণ [পুত্র]	১৭৮৩ ,,	৫৬
১৮।	শিবেন্দ্রনারায়ণ [পুত্র]	১৮৩৯ ,,	৮
১৯।	নরেন্দ্রনারায়ণ [দত্তকপুত্র]	১৮৪৭ ,,	১৬
২০।	নৃপেন্দ্রনারায়ণ † [পুত্র]	১৮৬৩ ,,	

* এই মহারাজ দুইবার রাজত্ব করেন।

† বর্ত্তমান মহারাজ।

কমিসনরগণের নাম	কোন্‌সময় হইতে
কর্ণেল হটন	১৮৬৪ ফেব্রুয়ারী
কর্ণেলব্রুস ও এগন্যু [প্রতিনিধি]	১৮৬৫ জুলাই
কর্ণেল হটন	১৮৬৭ জানুয়ারী
রিচার্ডসন্‌ ও মেট্‌কাফ্‌	১৮৭৩ মার্চ্চ
হর্শেল	১৮৭৪
ককারেল *	১৮৭৫
লর্ড ইউলিক ব্রাউন	১৮৭৬ হইতে ১৮৮৩ নবেম্বর
ডিপুটী কমিসনর	
মেঃ বিভারিজ	১৮৬৪ নবেম্বর
মেঃ স্মিথ	১৮৬৬ মে
মেজরলেন্স [প্রতিনিধি]	১৮৬৮
মেঃ বেকেট ঐ	১৮৭০ ডিসেম্বর
মেঃ স্মিথ	১৮৭২
কাপ্তান লুইন	১৮৭৫
মেঃ ডেণ্টন	১৮৭৬
কাপ্তান গর্ডন [প্রতিনিধি]	১৮৮১ এপ্রিল
মেঃ ডেণ্টন	১৮৮২ হইতে ১৮৮৩ নবেম্বর

* ইনিই রাজসাহী ও কোচবিহার বিভাগের প্রথম কমিসনর।